## KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M T[illegible]MER LANE, KOLKATA-700009

| | |
|---|---|
| Record No : KLMLGK 2007 | Place of Publication: ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৬ |
| Collection : KLMLG | Publisher: আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত |
| Title: সমকালীন (SAMAKALIN) | Size: 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m. |
| Vol. & Number: ২১/-<br>২১/-<br>২১/-<br>২১/-<br>২১/- | Year of Publication: জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০ ॥ June 1973<br>আষাঢ় ১৩৮০ ॥ July 1973<br>ভাদ্র ১৩৮০ ॥ Sep 1973<br>কার্তিক ১৩৮০ ॥ Nov 1973<br>অগ্রহায়ণ ১৩৮০ ॥ Dec 1973 |
| | Condition: Brittle Good |
| Editor: আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত | Remarks: |

C.D. Roll No. : KLMLGK

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

# সমকালীন

একবিংশ বর্ষ ॥ ভাদ্র ১৩৮০

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

# আয়করদাতাগণ

আয়কর বিভাগ একটি করে

**স্থায়ী অ্যাকাউণ্ট নম্বর**

দিয়েছেন প্রত্যেক করদাতাকে যাতে তাঁদের কাছ থেকে টাকা জমা দেওয়ার চালান, আয়করের বিবরণ (রিটার্ন) এবং অন্যান্য চিঠিপত্র যা আসবে তা ঠিকমত খাতাপত্রে তুলে 'ফাইল' করে রাখা যায়। যদি ভুলক্রমে আপনাকে দুটি স্থায়ী অ্যাকাউণ্ট নম্বর দেওয়া হয়ে থাকে কিংবা একটিও দেওয়া না হয়ে থাকে তাহলে আপনার আয়কর নিরূপণকারী আয়কর আধিকারিক/আয়কর সংক্রান্ত কমিশনারকে আপনার দ্বিতীয় নম্বরটি কেটে দেবার জন্য কিংবা একটি নম্বর দেবার জন্য অনুরোধ করুন। আয়কর-রিটার্ন ও চালান বা যে কোনও সংশ্লিষ্ট চিঠিপত্রে অনুগ্রহ করে আপনার স্থায়ী অ্যাকাউণ্ট নম্বরের উল্লেখ অবশ্যই করবেন। তাতে আয়কর বিভাগ আরও দক্ষতার সঙ্গে আপনার সেবা করতে পারবে।

দি ডিরেক্টোরেট অফ ইন্সপেকশান (রিসার্চ, স্ট্যাটিসটিক্স অ্যাণ্ড পাবলিকেশান) নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রচারিত।

davp 73/162



একবিংশ বর্ষ ৫ম সংখ্যা ॥ ভাদ্র তেরশ' আশী

সমকালীন ॥ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা


## সূচীপত্র


নেতৃত্ব ॥ মানসী দাশগুপ্ত ২০৫

ন্যাশনাল থিয়েটার, নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন ও বাংলা নাটক ॥ পুলিন দাশ ২১৪

বিক্রমপুরের আটপৌরে ভাষা ॥ ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৫

স্বখাত সলিল ॥ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৯

প্রাচীন ভারতে নৌ বাণিজ্য ॥ উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ২৩২

রাজা ও তপতী নাটকে সঙ্গীত যোজনার নাটকীয় তাৎপর্য ॥ বিমলভূষণ চট্টোপাধ্যায় ২৩৬

বঙ্কিম সাহিত্যের বর্ণানুক্রমিক আলোচনা ॥ অশোক কুণ্ডু ২৪০

সমালোচনা : স্বদেশীয় ভারত বিদ্যাপথিক ॥ সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪৪

Massage of India ॥ সুশীলকুমার গুপ্ত ২৪৭



সম্পাদক ॥ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

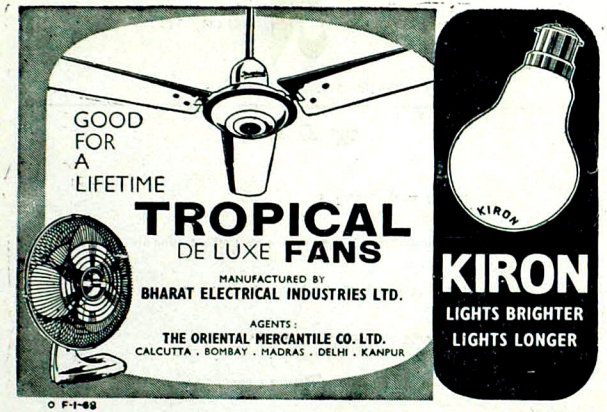


*সমকালীন*

প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখে)। বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক সাড়ে সাত টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাকটিকিট বা রিপ্লাই কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে' প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদি নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না—সমকালীন 'প্রবন্ধের পত্রিকা'। লেখার মধ্যে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করবেন না। ইংরেজীর পরিবর্তে বাংলা হরফে লিখে দেবেন।

'সমকালীন'-এর গ্রন্থ-পরিচয় প্রসঙ্গে, রসিক সমালোচকদের দ্বারা 'শিল্প', 'দর্শন', 'সমাজ-বিজ্ঞান' ও সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থের বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোন : ২৩-৫১৫৫

ভাদ্র
তেরশ' আশী

সমকালীন

একবিংশ বর্ষ
৫ম সংখ্যা

# নেতৃত্ব

মানসী দাশগুপ্ত

নেতৃত্বের ব্যর্থতা বলে একটা কথা চালু করে দেওয়া হয়েছে বেশ কিছুদিন—এর জন্য অবশ্য সাংবাদিক নেতৃত্বকে ধন্যবাদ দিতে হয়। সাংবাদিকরা হচ্ছেন ঘোড়ার লেজের ডগায় বসে থাকা মাছির তুল্য শক্তিশালী, ঘোড়া যেদিকে যায়, মাছি সেদিকে যায়—তার মানে এই নয় যে ঘোড়াটা মাছিকে পথনির্দেশ করে নিয়ে যাচ্ছে, বরং উল্টো, মাছিই ঘোড়াকে চালাচ্ছে—পরিচালনার বিপরীত অর্থে। অর্থাৎ কিনা মাছিকে এড়াতে ঘোড়াকে সরে সরে যেতে হচ্ছে, এই ঋণাত্মক প্রচেষ্টার সুবাদে মাছি হয়ে উঠছে ঘোড়ার গতির উদ্দীপক। এড়িয়ে চলার চেষ্টা ছাড়াও ঘোড়াকে আরেকটি চেষ্টা করতে হয়, সেটি হচ্ছে নিজপথে এগিয়ে যাবার চেষ্টা, সেই সমুখগতি অবশ্য মাছির নিয়ন্ত্রণে নেই, স্পষ্টতই মাছি ঘোড়ার একমাত্র চালক নয়। অসমজাতীয়ের গতির সঙ্গে অবশ্য মানবীয় গতির বহু প্রভেদ রয়েছে, কিন্তু বিপরীত ও সমুখগতির একটা সমাহার উভয়ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হয়, নইলে এগোনো যায় না। নেতা যে স্তরের এবং যে দরের হোন না কেন, তাঁকে বিপরীত উদ্দীপনা দেবার জন্য নানা মন্তব্য আসেই কেবলমাত্র তার দ্বারা তিনি নিজের সারথ্যকে নির্দেশিত হতে দিতে পারেন না। নেতৃত্বের নিজস্ব লক্ষ্য স্থির রাখতে হয়।

গতির কথাটা নেতৃত্বের ভিতরে ধরা থাকে, যা চলমান নয়, যার কোনো যাত্রা অথবা লক্ষ্য নেই, তাকে নেতৃত্ব দেওয়া যায় না, গাছ পাথরের কোনো নেতা নেই। আমরা যখন পর্বতে শীর্ষস্থানের কথা বলি, বনস্পতির প্রাধান্যের কথা তুলি, তখন মূল্য প্রাধান্যের কথা এসে যায়। সেই বিশেষ অর্থে শ্রেষ্ঠত্বের সুবাদে, বনস্পতিকে কিংবা সেরা পাহাড়কে নেতার পদমর্যাদা দেওয়া হয়তো চলে। অর্থাৎ নেতা মানে দলপতি, রাজা, শ্রেষ্ঠ—এ কথাটাও সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করবার মতো নয়।

যেক্ষেত্রে গতি নেই, অথবা থাকলেও সে গতি কোনমতেই আত্মকর্তৃত্বাধীন নয়, ( যেমন গাছের ) সেখানে উর্ধ্বগতি অধোগতির মান নিয়ে করণীয় কিছু নেই, শুধু মানুষকে মানু বলতে পারলেই সেখানে কর্তব্য শেষ। এরকম নিঃশর্ত উপস্থাপনায় মানুষকে দেখা শক্ত, কোনোকালে যখন দেখা হয়েছে তখন মানবশ্রেষ্ঠ বলে চিহ্নিত রাজা অথবা ব্রাহ্মণের হাতেই নেতৃত্বের রশি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সে রকম নির্ঝঞ্ঝাট বন্দোবস্ত চলতে থাকলে অধিকাংশ মানুষই যে তাতে সায় দিতো এতে সন্দেহ করার খুব বেশি কারণ নেই। কিন্তু এ ব্যবস্থা চললো না, কেননা মানুষের জীবনে চলমানতা এবং গতি ঢের বেশি স্পষ্ট এবং প্রত্যেক মানুষই তার নিজের জীবনে এই গতি অনুভব করার সম্ভাবনাকে প্রত্যহ অল্প অল্প করে পুষ্ট করে তোলে ; জীবনের পথে মানুষ কেন যে চলছে, কোথায় চলছে, এইসব লক্ষ্য-নিশানা-সংক্রান্ত মনপ্রাণ উদাস করা চিন্তাও প্রত্যেকের মনে কখনো কখনো উদয় হয়। যিনি মানবশ্রেষ্ঠ বলে, রাজা বলে বিবেচিত, তিনি যদি এমন পথে কাউকে চলতে বলেন যা তার আদৌ মনে ধরছে না, এমন লক্ষ্যে পৌঁছতে বলেন যা তার ধারণার অগম্য, তাহলে তাঁর নেতৃত্ব নির্দেশ মেনে চলার ব্যাপারে রীতিমতো গোল বাধে। বেশ কিছু মানুষ যদি এইরকম গোলমালে পড়ে, তাহলে নেতৃত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ না জেগে যায় না। সে সন্দেহে রাজা বা ব্রাহ্মণকেও জনতার কোপে পড়তে হয়। যিনি নেতা, তিনি মানবশ্রেষ্ঠ হলেও মানবই তো, কাজেই এত বিদ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ দিতে হলে যে অলৌকিক বলের প্রয়োজন পড়ে সে বল প্রায়ই তাঁর আয়ত্তগম্য থাকে না। তখন তিনি সকলের হিসেবে একেবারে বাতিল হয়ে যান। এজন্যই, মানুষের সমাজে নেতৃত্বের বিচারে মানবিক গুণগত শ্রেষ্ঠতার চেয়েও পথনির্দেশনার দক্ষতাকে হিসেবের ভিতরে ধরতে হয় বেশি। সকলের মন-মতি বুঝে পথপরিচালনা করা আর গুণীশ্রেষ্ঠ মানুষ হয়ে ওঠা তো এক জিনিষ নয়, এ কথা আমরা এখন আর ভুলে যেতে পারি না। এ রকম ভুল যখন হতো, সকলের পথপরিচালকের ভূমিকা আর মানবশ্রেষ্ঠ গুণীর ভূমিকাকে এক করে দেখে যখন রাজাকে মেনে নেওয়া হতো, তখন রাজারা হয় প্রথম ভূমিকায়, নয় দ্বিতীয়টিতে, নয়তো দুটিতেই ব্যর্থতা দেখিয়েছেন, ইতিহাসে সে সব ব্যর্থ রাজাদের কথা আমরা পড়েছি। সে সব ব্যর্থতার মাপকাঠি কী ? কেন তাঁদের ভূমিকা ব্যর্থ ? তাঁরা কি নিজেরা নিজেদের ভ্রান্ত, অপপরিচালিত মনে করেছিলেন ? না। তাঁরা তাঁদের ভূমিকাকে জনতার কাছে,—যাদের জন্য রাজার এ ভূমিকার নাম রাজা,—তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারেন নি। জনতা যে কেবলমাত্র দর্শক নয়, জনতাই প্রকৃত নির্দেশক—রাজশক্তির এই অন্তর্নিহিত দ্বান্দ্বিকতাটি এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাজার ভূমিকাই হলো জনতাকে নির্দেশ দেওয়া, রাজাই জনতার পরিচালক, জনতা যখন প্রসন্ন অনুগত, আভূমিনম্র তখন এতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। অথচ, যে মুহূর্তে জনতা অপ্রসন্ন হয়ে উঠলো, তখন এ সত্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে রাজার শক্তি জনতারই শক্তি, জনতার আনুগত্য বিনা রাজা আর রাজা নন। তখন, ভয় দেখিয়ে হোক, অন্য কৌশলে হোক, জনতার আনুগত্য ফিরিয়ে আনার একান্ত প্রয়াসে ব্রতী হতে হয় রাজাকে, তাতে ব্যর্থ হলে তাঁর রাজা সাজা শেষ। রাজা যখন তাঁর ক্ষমতার তুঙ্গে, তখন তিনি ইচ্ছে করলে হয়তো জনতার অংশকে বিনষ্ট করলেও করতে পারেন, কিন্তু যতো বড়ো রাজাই হোন, ইচ্ছে করলে জনতা সৃষ্টি করা তাঁর ক্ষমতার মধ্যে থাকে না। অন্যদিকে, জনতা নিঃসন্দেহে রাজাকে সৃষ্টিও করে, বিনষ্টও



করে। ক্ষমতা জনতারই, রাজার শ্রেষ্ঠতা জনতার স্বীকৃতিনির্ভর। এইখানেই রাজা খুব লক্ষ্যণীয়ভাবে ভগবান থেকে সম্পূর্ণত ভিন্ন। মানুষের কাছে ভক্তি-ভালবাসা কিছু না পেলেও ভগবান ভগবানই থাকবেন—তাঁর নিত্যলীলায় মগ্ন, কিন্তু প্রজার আনুগত্য ব্যতিরেকে, চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো মানুষ না পেলে, রাজার প্রভুত্ব শেষ। অর্থাৎ রাজা একটি আপেক্ষিক অস্তিত্ব, ভগবান তা নয়। স্বর্গীয় ন্যায়বিধানের পরোয়ানা নিয়ে পার্থিব প্রভুত্বকে স্থায়ী করা যায় না। প্রভুত্বের পালা শেষ হয়ে গেলেও রাজভূমিকায় যিনি অবতীর্ণ ছিলেন তিনি যদি যথার্থ শ্রেষ্ঠ মানুষ হয়ে থাকেন, তাঁর গুণাবলীর জন্য নমুনা তিনি একটি সাধারণ ব্যক্তি হিসাবে দিলেও দিতে পারেন। সে রকম শ্রেষ্ঠত্বের নমুনা অবশ্য আমরা বড় একটা দেখতে পাই না, তার কারণ, জনতার রোষ প্রায়ই প্রাণঘাতী। যাকে তারা একদা প্রভু বলে মান্য করেছিল সে যে মানের উপযোগী রইলো না, এতে সে-হতমান ব্যক্তির বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকারটুকু রক্ষা করা খুব শক্ত হয়ে ওঠে। এসব তত্ত্ব বহু পূর্বে অনেকে নানাভাবে বলে গেছেন। এসব কথা এখন আবার নতুন করে মনে করার বিশেষ প্রয়োজন হলো এই যে, এখন যে-নেতৃত্বের ব্যর্থতার কথা আমরা শুনে থাকি ( কখনো কখনো বলেও থাকি ) তার সঙ্গে এই রাজকীয় ব্যবস্থার ব্যর্থতার বেশ কিছু তফাৎ থাকলেও মূলে একটা মিলও রয়েছে। সে আলোচনায় যাওয়ার আগে প্রাচীন কাঠামোটা তাই মনের ভিতরে স্পষ্ট করে নেওয়া ভালো।

নেতা বলতে এখন আমরা গুণী বা শ্রেষ্ঠ মানুষ বুঝি না। রাজশক্তি যে আসলে জনতারই শক্তি এ কথা পরিষ্কার বুঝে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ রকম ধারণা তৈরী হওয়া বিচিত্র নয় যে আসলে জনগণের প্রতীক হস্তী যাকে পিঠে তুলে নেয় সে মানুষই এরকম উচ্চতা পেয়ে যাবে, তার জন্য কোনো বিশেষ গুণপনার প্রয়োজন নেই, শ্রেষ্ঠতার তো নয়ই। এইরকম কথা বুঝে নিয়ে আমরা জেনেছি যে পদাধিকারই আদত অধিকার, সেই বলেই মানুষ অধিকারী হয়ে থাকে। 'রাণী করো পাবো রাণীর প্রকৃতি'। এই জড়বাদী, অবস্থাগতিকের-বলে-আস্থাশীল চিন্তার প্রতিকূলে তবুও 'সবাই হয় না রাণী কল্যাণী' কথাটির ক্ষীণ প্রতিবাদ এখনো শোনা যায়। এ বিশ্বাস এখনো কোনো কোনো পণ্ডিত এবং কিছু সংখ্যক সাধারণ মানুষের অস্ফুট চিন্তায় রয়ে গেছে যে, ব্যক্তি-চরিত্রের এক বিশেষ গুণে নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা দেখা যায়, সে গুণটি কারো ভিতরে আছে, কারো ভিতরে নেই, যে নেতা সে স্বভাব নেতা, নেতাকে বানিয়ে নেওয়া যায় না। পদাধিকার দিলেই কেউ নেতা হয়ে ওঠে না।

নেতৃত্বের স্বভাবজ গুণপনার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন তার মূল কথা হলো এই যে সমস্ত মানুষের সুখদুঃখকে যিনি নিজের সুখদুঃখ বলে অনুভব করতে পারেন, এবং মানুষের দুঃখগুলিকে আড়াল করে দাঁড়াতে পারেন তিনিই রাজা। এ অর্থে সাধু সজ্জনের রাজা বলা যায়। সেরকম কখনো বলা হয়না এমনও নয়। কিন্তু রাজকার্য শুধু মানুষের দুঃখনিবারণ এবং সর্বজনে সমবেদনা-বোধের সঙ্গে একীকৃত হতে পারে না, রাজার সাহায্যে রাজ্যের সম্পদবৃদ্ধি হবে—এ প্রত্যাশা প্রজাদের থাকে। সে প্রত্যাশা সাধুসজ্জনদের দিয়ে মিটবার নয়। প্রজাদের প্রত্যাশিত এ সম্পদ বাস্তব ধনসম্পদ, একে বাড়িয়ে তোলবার জন্য কার্যকরী কাণ্ডজ্ঞান লাগে, যার অভাবে ধর্মজ্ঞানে তারতম্য না ঘটতে পারে, রাজকর্মে হানি হয়ে থাকে। রাজকর্তব্যের এদিকটা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ

পর্যন্ত চিন্তা ব্যয় করেন নি। বউঠাকুরাণীর হাট থেকে শুরু করে নানা কাহিনী নাটকে রবীন্দ্রনাথ যথার্থ মহান রাজা আর রাজকোষের হীন রক্ষাকারীর বৈপরীত্য বেশ স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন, কিন্তু মহত্তম রাজারও যে অন্যতম প্রধান কর্তব্য রাজকোষের রক্ষণাবেক্ষণ, অন্যথায় রাজ্যের অর্থ নৈতিক উন্নতিতে টান পড়ে, এ কথা তিনি, মনে হয়, ইচ্ছে করেই খেয়াল করেন নি। তাঁর রচনা পড়লে মনে হয়, সবাইকে নিজ নিজ ইচ্ছায় কাজ করতে দিলে এবং অভিরুচি মতো কর্মে স্বাধীনতা দিলে ধনসম্পদ স্বভাবতই বৃদ্ধি পাবে, এই রকম গা-এলানো ( laissez faire ) নীতিতে তাঁর মনে মনে আস্থা ছিলো। অন্যদিকে, জনসাধারণের স্বার্থে জনকল্যাণকর কাজগুলি রাজারই করণীয়। এ রকম মতও তিনি প্রকাশ করেছেন, কিন্তু জনকল্যাণকর কাজের জন্য রাজা সম্পদ সংগ্রহ করবেন কোথা থেকে, এ নিয়ে তিনি কোনো স্পষ্ট নির্দেশ দেন নি। হয়তো তিনি ভাবতেন রাজা যেভাবে অর্থসংগ্রহ করে থাকেন তা তো তিনি করবেনই, শুধু সে অর্থ যে প্রজার কল্যাণে ব্যয় করা কর্তব্য এ কথাটা রাজাকে মনে রাখতে হবে, আর, লোকে যে যা করছে তাদের স্বাভাবিক আত্মবিকাশে বাধাসৃষ্টি বা তাদের ওপরে জোরজুলুম করা যে যথার্থ রাজকীয় কর্ম নয়, এ বোধও রাজার মনে রাখা প্রয়োজন। নানা যুক্তি ও আবেগের আবেদন দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এ কথাটিই স্পষ্ট করেছেন। যথার্থ রাজাকে মানুষ ভক্তি করবেই, এরকম বিশ্বাস তাঁর ছিলো। অর্থাৎ, রাজা জনপ্রিয় হলেই সমস্যাটা মিটে যায়। কিন্তু, সে জনতা যে কোন জনতা যার মানদণ্ডে প্রিয় হলে রাজা সকল রাজকীয় সদ্‌গুণের সমাহার হয়ে উঠতে পারবেন, আবার সকলের মনোহরণ করতেও সক্ষম হবেন, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বেশি মন্তব্য করেন নি, করবার কথাও নয়, সমাজনীতির সম্পূর্ণ তত্ত্বালোচনা কবি নিজস্কন্ধে তুলে নেবেন এমন প্রত্যাশা করা ঠিক নয়।

যে-নেতৃত্ব জনপ্রিয়তায় ও আত্মোৎসর্গ-প্রবৃত্তিতে মহান তাকে নাম দেওয়া হয় সম্মোহক নেতৃত্ব। এরকম নেতা রাজকীয় সাজেও দেখা দিতে পারেন, সম্পূর্ণ আধুনিক বন্দোবস্তের ভিতরেও তাঁকে পাওয়া সম্ভব। এ নেতাকে কেন্দ্র করে অনেক মুগ্ধতা সঞ্চারিত থাকে। এ ধরণের নেতৃত্ব সবচেয়ে বেশি দরকার পড়ে সংকটকালীন নীতি নির্ধারণে। সংকটকালে, খুব জরুরি কোনো অবস্থায় নেতা এসে বুক পেতে দাঁড়ালেন, বললেন 'হবেই হবে'—কী হবে, কেমন করে হবে, হলে সেটা ভালো হবে না মন্দ হবে, এ সমস্ত প্রশ্ন ভুলে গিয়ে জনতা আত্মগতো এক হয়ে গেলো তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে, এরকম দৃষ্টান্ত আমরা যুদ্ধে, বিপ্লবে, ইতিহাসের বহু পর্যায়ে আমরা দেখতে পাই। সংকটকালীন নেতৃত্বের মোহগ্রস্ততা নিত্যগত কর্মসম্পাদনে চালু রাখলে মানুষের স্বাভাবিক আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার ক্ষতি ঘটতে পারে না, কিন্তু নেতার পক্ষে কাজ চালিয়ে যেতে অনেকটা সুবিধা হয়। এ জন্য অনেক সময়েই আমরা দেখতে পাই নেতারা সর্বদাই সংকটকালের কথা বলছেন, জরুরি অবস্থার আর কিছুতে শেষ হচ্ছে না। নেতৃত্বে সম্মোহন থাকলে সাধারণ মানুষ সে কথা মেনে নিতে রাজিও থাকে, কেন না, সত্যি বলতে, এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকা তো অধিকাংশ মানুষের পক্ষে এক বিষম সংকটের ব্যাপার, সে অবস্থায়, জনস্বার্থে উৎসর্গিতপ্রাণ কোনো সম্মোহক নেতা যদি এসে বলেন, আমরা বিষম সংকটে পড়ে আছি, আমি যা বলছি তাই করলেই তোমরা এ সংকট থেকে নিজেদের এবং আমাদের সকলকে উদ্ধার করতে পারো—তাহলে তাঁর ডাকে অনেকের মনে সাড়া জাগে। কিন্তু সাধারণভাবে সম্মোহনের যে



সমস্যা এক্ষেত্রেও সেগুলি উপস্থিত থাকে, সকলে সমানভাবে সম্মোহিত হয় না, যারা সম্মোহিত হয়েছিল তাদের মোহও ক্রমে কেটে যায়, নিত্যনৈমিত্তিক সুখসুবিধার হিসাবগুলি মেলাতে হয় নেতাকে সংকটের আকস্মিকতা কেটে গেলে। তখন নেতৃত্ব মুগ্ধ না করলেও চলে, কর্মপটুতা দেখাতে হয় তখন নেতৃত্বকে। মোহবিস্তার করবার যোগ্যতা তাই নেতৃত্বের একটি প্রয়োজনীয়, মূল্যবান উপাদান হলেও অত্যাবশ্যক উপাদান নয়। বরং, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানকে বলা যায় নেতৃত্বের মূল, অত্যাবশ্যক উপাদান। এটি স্পষ্টতই শিক্ষাদীক্ষা ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয় যদিও সহজাত প্রবণতা ব্যতিরেকে অনেক অভিজ্ঞতা বৃথা যায়, তার থেকে কোনো শিক্ষা নিতে পারেন না কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তি। কাণ্ডজ্ঞানের সহজাত মূলটিকে চলিত ভাবে আমরা বুদ্ধি বলে থাকি কিন্তু মেধা অর্থে যে বুদ্ধি আর কাণ্ডজ্ঞানের যে সহজ বোধ এ দুইয়ে তফাৎ অনেক। বিমূর্ত বিষয়ে বুদ্ধি প্রখর হলে তাতে নেতৃত্বের সুবিধার চেয়ে বাধা হতে পারে।

নেতা এবং নিয়ন্ত্রিতের ভিতরে যোগসূত্র যাতে রাখা যায়, এই রকম গুণগুলি নেতৃত্বের অবশ্য প্রয়োজন। অন্যের মন বুঝবার ক্ষমতা, পর্যাপ্ত সমবেদনা এ জাতীয় গুণ। নেতার বুদ্ধি যদি নিয়ন্ত্রিতের চেয়ে এতোই বেশি হয়ে ওঠে যে, তিনি যা চান এবং যাকে মানবজীবনের আদর্শ বলে মনে করেন তা আর কেউ বুঝে উঠতেই পারে না, তাহলে এ যোগসূত্র রক্ষা করা শক্ত হয়ে ওঠে। আবার তেমনি, নেতার বুদ্ধি যদি নিয়ন্ত্রিতের সঙ্গে একেবারে এক স্তরে থাকে, তাহলে তাঁর পক্ষে নেতৃত্ব দেওয়া কঠিন হয় কেন না নেতাকে একেবারে বুঝতে না পারলে যেমন মুশকিল, বড়ো বেশি বুঝে গেলেও আবার কম মুশকিল নয়। বাহ্যিক ও সদ্যম উদ্রেককারী এ দুয়ের কী করে নিয়ন্ত্রিতের মনে জাগাতে হয়, সে বিষয়ে কোনো প্রশিক্ষণ সম্ভব নয়, কাণ্ডজ্ঞানের সাহায্যে নেতা এ ব্যবহারবিধি আয়ত্ত করেন। নিজের ও অন্যের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির গোপনীয়তা রক্ষার ক্ষমতাও নেতার আয়ত্তে থাকা দরকার। যে আদর্শ ও লক্ষ্যনিষ্ঠা থাকলে নেতা শ্রদ্ধেয় ও সার্থক হয়ে ওঠেন সেটি গড়ে তোলার ব্যাপারে উপরিউক্ত সদ্‌গুণগুলি অন্নবিস্তর সাহায্য করে। দেদিক থেকে ভেবে দেখলে নেতৃত্বের রূপায়নে সহজাত কতকগুলি প্রবণতা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতানুসারী অনুশীলন-এ দুয়েরই সমযত্ন প্রয়োজন। নেতা জন্মসূত্রে নেতা না নেতৃত্ব পরিবেশের প্রভাবে সৃষ্টি করা যায়—এরকম প্রশ্ন তোলাই সেক্ষেত্রে অবান্তর।

নেতা একই কালে তাঁর সমগ্র নিয়ন্ত্রণাধীন জনতার কাছে সমানভাবে আয়ত্তগম্য থাকেন না। খুব কাছের শিষ্টবৃন্দ, দল, এবং জনসাধারণ এইরকম তিনটি বিভাগ প্রায় সর্বত্রই সর্বদা রয়ে যায়। এই নিকটতম মানুষগুলি যদি নেতার স্বনির্বাচিত হয়, এদের যদি তিনি নিজগুণে আকর্ষণ করে থাকেন, তাহলে যে বিনাপ্রশ্ন আজ্ঞাকারিতা তাঁর কাজের জন্য প্রয়োজন তার অভাব ঘটে না। অন্যথায়, পদমর্যাদাবলে যদি তাঁকে এঁদের গ্রহণ করতে হয়—যেমন প্রথাানুসারে নতুন রাজা এসে পুরাতন মন্ত্রীসভাকে গ্রহণ করতেন, কিংবা, এখন যেমন শিক্ষাক্ষেত্রে নবনিযুক্ত প্রশাসনিক ( প্রধান শিক্ষক, অধ্যক্ষ, কিংবা সহ-উপাচার্য কি উপাচার্য ) এসে প্রাচীন শিক্ষকদের কিংবা শিক্ষা-কর্মচারীদের গ্রহণ করেন, তাহলে বাহ্য আজ্ঞাকারিতার অন্তরালে আস্থার যোগ্য অনুবর্তন পুরো আছে কিনা তা নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে ওঠে, নেতা তখন নিঃসঙ্গ, এমন কি, কখনো কখনো বিপন্ন বোধ করেন। যেহেতু নিকটতম অনুবর্তীরাও দূরের জনগণ অথবা অন্তরগত শক্তির বিরোধে নেতাকে পরিত্যাগ

করে যাবেন কিনা এ বিষয়ে কোনো নিশ্চিত আস্থা তাঁর মনে সঞ্চারিত হওয়া শক্ত, তাই এ অবস্থায় নেতাকে অনুবর্তীদের তথা সর্বসাধারণের স্বার্থ দেখার সঙ্গে সঙ্গে নিজের পদরক্ষা তথা স্বার্থরক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। এ দুই স্বার্থ সম্পূর্ণত এক হয়ে গেলে ব্যাপারটি যতো সুচারুরূপে সম্পন্ন হোতো, ততোখানি ঐক্যবিধান প্রায়ই কঠিন হয়। ফলে, নেতা সময়ে সময়ে যখন তাঁর বিরুদ্ধে দল ভারি হচ্ছে দেখে বলতে থাকেন যে জনস্বার্থের বিরুদ্ধে চক্রান্ত হচ্ছে, তখন তাঁর নিয়ন্ত্রিতদের একাংশই আড়ালে মুখ টিপে হাসেন কি না সে বিষয়ে নেতা নিঃসন্দেহ হতে পারেন না। অন্য যাঁরা নেতার সঙ্গে একাত্ম ভাব দেখাতে চান তাঁরা এ প্রচারে যোগ দেন, চক্রান্ত বন্ধ করাই তখন এই দ্বিতীয় অংশের এবং স্বয়ং নেতার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, মূল কর্ম লক্ষ্যগুলি গৌণ হয়ে যায়। যে-কোনো স্তরের নেতৃত্বেই এসব লক্ষণ দেখা যায়, সে নেতৃত্ব কোনো সাংস্কৃতিক দলেরই হোক কিংবা অন্য কোন কর্মকেন্দ্রেরই হোক।

সাধারণভাবে নেতৃত্বের কথা বললে আমাদের সরকারী তথা রাজনৈতিক ক্ষমতাচক্রগুলির কথা মনে পড়ে যায়। সরকারের হাতে থাকে রাষ্ট্রের সংগঠনের সার্বিক শক্তি, সে শক্তির পরিচালনায় যে ধরণের নির্দেশে প্রকাশ পায়, সমাজের সর্বস্তরে নেতৃত্বের ধারা সেই গতিপ্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। রাষ্ট্রশক্তির ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের এই নিরংকুশ প্রভাব গণতান্ত্রিক বিধানে এবং আনুষঙ্গিক নিয়ম-রীতির কল্যাণে সম্প্রতি যতো বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, এতদূর প্রভাব চিরকাল এমন ভাবে ছিলো কি না, সামাজিক নিয়মগুলি নিজ ক্ষেত্রে সার্বভৌম ছিলো কি না, সে আলোচনা এখানে তোলা হচ্ছে না। রাজনীতিক নেতৃত্বের সঙ্গে সমাজে ব্যাপ্ত নেতৃত্বভঙ্গীর মিল না থাকলে সমাজ-জীবনে কিছু অসঙ্গতি ও পরস্পর বিরোধিতা দেখা যায়, এর লক্ষণ নিয়ে আমরা কিছু আলোচনা করতে পারি, কেন না এর খুব সহজ দৃষ্টান্ত আমরা এখন আমাদের দেশে দেখতে পাচ্ছি। নেতৃত্বে যে সংকট দেখা দিয়েছে, যা লক্ষ্য করে নেতৃত্বের ব্যর্থতার কথা শোনা যাচ্ছে তার মূল এই সমাজের আভ্যন্তরীণ নেতৃত্ব-রীতির স্ববিরোধিতা। এ স্ববিরোধিতা আমাদের সমাজে চিরকাল ছিলো, এমন মনে করবার কোনো কারণ নেই। আমাদের প্রাচীন রাজনীতির কেন্দ্রে যখন ছিলেন রাজা আর তাঁর পূজ্য মন্ত্রদাতা ছিলেন ব্রাহ্মণ, তখন পারিবারিক নেতৃত্বভঙ্গী এবং রাজনীতিক নেতৃত্বভঙ্গী একে অন্যের ছাঁচে ঢালা ছিলো। উচ্চনীচ অবস্থান এবং ক্ষমতা বিন্যাসের এক চেহারা দেখা যেতো সর্বত্র, বর্ণ এবং বয়সকে কেন্দ্র করে নেতৃত্ব প্রত্যাশিত আকার নিতো। নেতৃপদে যাঁরা বৃত তাঁরা কী উপায়ে অবস্তনদের নিয়ন্ত্রণে রাখবেন, আর, অধস্তন সকলে নিয়মানুসারী কোন্ প্রথায় সে সকল নিয়মকে মান্য করবেন, তার একটা স্বীকৃত রীতি ছিলো। অর্থাৎ, নেতৃত্ব যে দেবে এদের ভূমিকা সুষ্ঠুভাবে সীমান্বিত ছিলো। এর ভিতরে নিয়মভঙ্গের অবকাশ ছিলো না এমন নয়, সে সব বিচ্যুতি বিষয়ে শাস্তি এবং প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও বেশ যত্ন করে তৈরি করা হয়েছিল, আর সেই সযত্নরচিত রীতিনীতি নিষ্ঠুর হয়তো ছিলো, কিন্তু কোনো জটিলতা ছিলো না সেগুলির ভিতরে। রাজনীতির স্তরে এখন রাজকীয় মর্যাদাকে ঘিরে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার পরিবর্তে গণতান্ত্রিক রাজনীতি চালু হয়েছে। এ রীতি যেদিন আমাদের শাসনতন্ত্র গৃহীত হলো, সেদিন চালু হয়েছে তা নয়। এ শাসনতন্ত্র গ্রহণের বহু পূর্বে, আমাদের সমাজের বাকপটু চিন্তাশীল, উদ্যোগী ব্যক্তিরা রাজ্যনের প্রতিষ্ঠিত বিদেশী শক্তির বিরোধিতা



করছেন, তাঁদের মাধ্যমে আমরা রাজশক্তিকে অত্যাচারী জ্ঞানে পরিত্যাজ্য ভাবতে শিখে গিয়েছি। আমাদের নিজস্ব বিরোধী নেতৃত্বই যে দেশের জনতার যথার্থ স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত, ক্ষমতাসীন রাজশক্তির নেতৃত্ব যে গ্রহণীয় নেতৃত্ব নয়—এ কথাটাও আমাদের মুখে মুখে কতকটা ছড়িয়েছে। উপস্থিত নেতৃত্বের বিরোধ যে সপক্ষ নেতৃত্ব গড়ে তোলার একটা উপায়, বিরোধ মানেই যে বিচ্যুতি বা নীতিচ্যুতি নয়, এ কথাটা সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের কালেই আমাদের রাজনীতিক নেতৃবৃন্দের মনে ব্যবহারে রূপ নিয়েছিলো, শিক্ষিত রাজনীতিক চেতনায় এ ভাবটি ছড়িয়েছিলো। গণতন্ত্র প্রসারের সেই পর্যায়ে কিন্তু সমাজ-বিন্যাসে এবং পারিবারিক সম্বন্ধ বিধানে অভ্যস্ত উচ্চনীচ ভেদ রয়ে গেলো, এবং নেতৃত্ব উপর থেকে নিচে, বৃদ্ধ থেকে প্রৌঢ়ে ন্যস্ত হতে থাকলো অতি পুরাতন ঐতিহ্য অনুসারে। পিতৃপিতামহের নির্দিষ্ট পথে বিনাপ্রশ্নে চলাই যে মানবজীবনের ধ্যেয় এবং লক্ষ্য—এ কথা সাধারণভাবে স্বীকৃত রয়ে গেলো। অথচ, আগেই যেমন বলেছি, রাজনীতিক নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানকে কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠান বলেই মান্য করতে হবে এ চিন্তার মূলে আঘাত পড়লো। নিয়ম-বিরোধিতার নিয়মানুগ রূপায়ন—যার অন্য নাম গণতন্ত্র—রাজনীতি ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য হয়ে উঠলো। আমাদের সমাজাদর্শে আভ্যন্তরীণ স্ববিরোধিতার সুরু হলো সেখানেই।

রাজনীতিক নেতৃত্ব আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মেনে নিয়ে সকলকে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন। বিরোধীপক্ষ নিয়ম করে প্রতিষ্ঠিত নিয়মগুলির যথার্থকে প্রশ্ন করে, পরিবর্তিত করে দিতে পারবে, এ সম্ভাবনার সূত্র আছে এ বন্দোবস্তে। অথচ, আমরা এখনো প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত প্রশ্ন তুলতে অভ্যস্ত নই, নিয়মানুগ বিরোধিতা বিষয়ে পরিষ্কার অপরিষ্কার কোনো ধারণাই আমাদের তৈরি হয়নি বললেই হয়। আমরা সাদা-কালোয় ভাবতে জানি, নির্দেশ দিলে চলতে জানি, নির্দেশ না মানতে পারলে সব ভেঙে চুরে কিংবা ত্যাগ করে কালা পাহাড় কিংবা সন্ন্যাসী হয়ে যেতে জানি। দিনের পর দিন প্রাণপণ চেষ্টা করে নিয়ম রাখার জন্যই-যে অপ্রয়োজ্য নিয়মগুলিকে সরানো দরকার—এ বিশ্বাসে আমাদের কোনো জোর আসেনি। গণতন্ত্র মানে নিয়মতন্ত্র। রাজার বদলে রাজসম্মানে সর্বস্বীকৃত কতকগুলি নিয়মকে প্রতিষ্ঠা করা হবে, যেগুলিকে আবার প্রয়োজনমতো পুনরায় সর্বস্বীকৃতির ভিত্তিতেই পরিবর্তিত করা যাবে—গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কথাটার মানে হলো এই। এসব ভাবনা আমাদের বাক্যে, ব্যবহারে ও বিশ্বাসে ছড়িয়ে যাবার পূর্বেই আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক কাঠামো খাড়া হয়ে গেছে রাষ্ট্রপর্যায়ের নেতৃত্বে। এ যেন খেলার নিয়ম শিখে নেবার আগেই খেলতে বসে যাওয়া। এতে যদি গোল না বাধে তো কিসে বাধবে!

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নেতৃত্ব যারা নেবে আর যারা দেবে এরকম দুটি পরিচ্ছন্ন ভাগ রাখা সম্ভব নয়। উপর থেকে নির্দেশ আসছে, আর নিচের থেকে সবাই তাকে মেনে নিচ্ছে, এ রকম ব্যবস্থা তো গণতন্ত্রে চলতে পারে না। সর্বস্বীকৃতির কথা উঠলেই সর্বজনমতের কথা ওঠে, নেতৃত্বকে ব্যক্তিগত আত্মনিয়ন্ত্রণের তুল্য করে তুলতে হয়, এ জন্য প্রত্যেকটি মানুষকে তার নিজ নিজ জীবনের লক্ষ্য ও সার্থকতা বিষয়ে অবহিত হতে হয়। এর জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন, তা কোনো বিশেষ শিক্ষাক্রমের চতুঃসীমায় ধরে রাখবার জিনিষ নয়, সেটি ধারাবাহিক চলতেই থাকে, বাল্য থেকে যৌবনে, যৌবন থেকে বার্ধক্যে, আত্মনিয়ন্ত্রণের এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে। এ শিক্ষা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের

শিক্ষা, উপরের দিকে নির্দেশের জন্য চেয়ে না থেকে নিজের জন্য নিজে ভাবতে শেখা। আমাদের সামাজিক জীবনে এ শিক্ষার ধারা এখনো ভালো করে এসে পৌছয়নি, আমাদের শিক্ষাসদনগুলিতে তো আদৌ পৌছয়নি। যদি পৌছাতো তাহলেও হয়তো কিছু কিছু সমস্যা রয়ে যেতো, তবে সে অবস্থা এখনকার চেয়ে সহনীয় হতো সন্দেহ নেই। নিজের লক্ষ্য নিজে ভেবে স্থির করে নেবার শিক্ষায় প্রত্যেক শিক্ষার্থী, প্রতিটি মানুষ, সমান দক্ষতা দেখান না। কিছু মানুষ সমস্যাটা তাড়াতাড়ি বুঝে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠেন, তাঁরা এগিয়ে আসেন নিজের মত দিতে, কিছু মানুষ পিছিয়ে থাকেন। দেশে ও সমাজে যেহেতু যে কোন সময়েই বিভিন্ন বয়সের এবং বিভিন্ন যোগ্যতার মানুষ একই সঙ্গে জনসাধারণের অঙ্গ হিসেবে উপস্থিত থাকেন, এই সমগ্রতাকে নিয়ে একটি চলমান জনমতের সৃষ্টি হয়। এর ভিতরে প্রতিটি ব্যক্তির নিজ মত প্রতিফলিত থাকে না, প্রতিটি ব্যক্তির নিজ মত বলে কিছু নেই বলেই। একে দুয়ে প্রতিজনের নিজ নিজ মত তৈরী হবে, সেগুলির ভিতরে কতটা মিলছে তার খতিয়ান নেওয়া হবে, তবে জনমত গড়বে—এ রকম আদর্শ ব্যবস্থা কোথাও নেই, থাকা সম্ভবও নয়।

আমরা জনমত বলে যাকে জানি তা কিছু মানুষের মত, যে মত নিজের সুষ্ঠু ও সুচিন্তিত প্রকাশে ও প্রচারের সুবাদে সকলের মত হিসেবে চলছে। কিছু কিছু মানুষ মতামত তৈরী করে ফেলে অন্যকে—যারা চিন্তায় অলস ও নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে বিলম্ব করেন, তাঁদের—সেই মতে প্রভাবিত করেন। এক একরকম মতকে ঘিরে সাধারণ মানুষ ভিতরে ভিতরে দলবিভক্ত হয়ে যান। এগুলির ভিতরে যার প্রচারের হাতিয়ার যতো শক্তিশালী, তার দল ততো ভারি হয়। গণপ্রচার গণতান্ত্রিক সমাজের এক অপরিহার্য অংশ। খবরের কাগজ, বেতার, দেয়াললিখন, স্লোগানের হাঁক ইত্যাদি বিবিধ উপায়ে গণপ্রচার চলে। যাঁরা ক্ষমতায় উঠেছেন, যাঁরা উঠতে চান, এঁদের পিছনে পাশে এবং বিপরীতে ছোট বড়ো চিন্তাশীল মানুষ যাঁরা আছেন তাঁদের মতামতের নির্গলিতার্থ আবেগযুক্ত ভাষায় প্রচার হতে থাকে এইসব মাধ্যমে সর্বসাধারণের জন্য। যেমন আবেগ যার মনঃপূত, সেই অনুযায়ী সে মানুষ নিজের দল খুঁজে নেয়। এ অবস্থায় দূরদর্শী চিন্তা এবং সুষ্ঠু প্রচারকে মেলাতে পারলে নেতৃত্বে পারদর্শিতা দেখানো যায়। নেতৃত্বে পারদর্শিতার সহজ প্রমাণ এবং পরিমাপ মেলে নিয়ন্ত্রিতদের আনুগত্যে।

গণতন্ত্রে যদিও আনুগত্যের চেহারা পালটেছে কিন্তু এই আদত কথাটা পালটায়নি যে আনুগত্য ব্যতিরেকে নেতৃত্ব নেই। নেতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রিতের সম্পর্ক ঠিক যাদুকরের সঙ্গে ভ্রাম্যমাণ জনতার সম্পর্কের সমতুল্য নয়। একটা লোক যাদু দেখাবে বলে ডাকলো আর দেখাতে পারলো না, এতে সাধারণ লোক যে ভাবে বীতশ্রদ্ধ হয়, একজন নেতার ব্যর্থতাতেও লোকের যদি সেই প্রতিক্রিয়া হয়, তাহলে বুঝতে হবে, আনুগত্য গড়ে ওঠার ব্যাপারে কিছু গোলমাল রয়ে গেছে। আমাদের দেশে সেইরকম গোলমাল আছে বলে মনে হয়। আনুগত্যকে কী করে গণতান্ত্রিক আত্মনিয়ন্ত্রণের সঙ্গে মেলানো যায় তার সূত্র মেলে নিয়মানুগত্যে। সেটি আমাদের কাছে ঠিকমতো পৌছয়নি, কেন না নিয়মানুগত্য জিনিষটা আমাদের কাছে কোনো ভদ্ররকম অনুষঙ্গ নিয়ে আসেনি। আমাদের এ পক্ষ, ও পক্ষ, সকল পক্ষের সকল চিন্তাবিদ যাঁরা বক্তব্য সর্ববিষয়ে উদ্ধৃত করেন, সেই রবীন্দ্রনাথ



ঠাকুর নেতৃত্ব বিষয়ে যেমন, নিয়মানুগত্য বিষয়েও তেমনি, কিছু শিথিল চিন্তার ঐতিহ্য আমাদের দিয়ে গেছেন যাকে কোনো গ্রাহ্য কর্মপন্থায় অনূদিত করা যায় না। 'হেরো অরণ্য ঐ, হোথায় শৃঙ্খলা কই' বলে তিনি যখন আমাদের প্রাণের বাণী শোনাতে চেয়েছেন, কোনো অজ্ঞাত কারণে তিনি খেয়াল করেন নি যে অরণ্য-প্রকৃতি তথা সমগ্র প্রকৃতির ভিতরে খুব কঠিন শৃঙ্খলা কাজ করে যাচ্ছে। শৃঙ্খলা থাকবে, অথচ তা পায়ে পায়ে শৃঙ্খল হয়ে বাজবে না, একে বলা হয় সুশৃঙ্খলা। এই সুশৃঙ্খলা বিধানই মানুষের জগতে নেতৃত্বের পিছনে আনুগত্য জমিয়ে তোলার মূল সূত্র। এ সূত্র রবীন্দ্রনাথের ছন্দে ধরা পড়েনি। প্রাণবন্ততাই আসল ( কী গূঢ় নিয়মে প্রাণবন্ততা নির্ভার, সহজ হয়ে থাকে কে জানে ) নিয়ম আবর্জনা মাত্র, এই ধরণের কাব্যময় বক্তব্যে তিনি মানুষের স্বাভাবিক নিয়মানুগত্যহীনতাকে কতকটা প্রশ্রয় দিয়ে গেছেন। এই প্রশ্রয় আমাদের ঐতিহ্যের অঙ্গ হয়ে উঠলো এমন এক সময়ে যখন নিয়মানুগত্য আমাদের একান্ত প্রয়োজন। এর ফলে, সমস্যা আমাদের জটিল হয়ে উঠছে। আমাদের আনুগত্য এখনো ব্যক্তিগত শ্রদ্ধাতে কিংবা আশু স্বার্থ বিধানে আবদ্ধ হয়ে আছে। আমরা তাই সামাজিক নৈর্ব্যক্তিক নিয়ম নিচয়গুলি ধরতে, গড়তে দরকার মতো ভেঙে পালটে ফিরে চালু করতে অনিচ্ছুক, কিন্তু পুট্টাপূর্তি কিংবা পণ্ডিচেরীতে আমরা সম্যক নিয়মানুগ, কেন না, সেখানে বাবা কিংবা মা রয়েছেন যে! তিনি যে-নিয়ম করেছেন, সেগুলি তিনি করেছেন বলেই মানতে হবে, নিয়ম বলে তো নয়। জনচিন্তার এই যে ধারা এটি আমাদের প্রাচীন সামাজিক প্রথাসম্মত চিন্তার উত্তরাধিকার। এটিকে নাড়া দেবার চেষ্টা করে রবীন্দ্রনাথ সমস্ত নিয়মকেই ত্যাজ্য করে জটিলতা আরো বাড়িয়ে গেছেন। দুয়ে মিলে আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও নিয়মানুগত্যের সামান্যতম চেষ্টাকেও সার্থক হতে দিচ্ছে না। আর, আগেই বলেছি, আনুগত্য না এলে নেতৃত্ব বলে কিছু দানা বাঁধতে পারে না। আনুগত্য দিতে পারবো, তবে তো আমাদের নেতা মিলবে।

# ন্যাশনাল থিয়েটার, নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন ও বাংলা নাটক

পুলিন দাশ

ন্যাশনাল থিয়েটার-এর প্রতিষ্ঠার ( ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৭২ ) ঠিক চার বছরের মাথায় ১৭ই ডিসেম্বর ১৮৭৬ এ এসে বিধিবদ্ধ হয়েছিল নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে সাহিত্য-সংসারের উপর আইনের বিধান নেমে আসতে দেখা গেছে। আইনের আওতায় নিয়ন্ত্রিত হয়েছে সাহিত্যপ্রয়াস এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। সেই সুদূর সময়ে গ্রীক-নাটকের বিকাশপর্বে থেসপিস-এর নাট্যপ্রয়াস সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল শাসনকর্তা সলোন্-কে। মিরাকল্ প্লে-র জায়গায় সেক্যুলর নাটকের আবির্ভাবের দিনে ক্ষমতাসীন প্রায় প্রত্যেকেরই ধারণা হয়েছিল যে নাটকের অভিনেতাদের উপর সতর্ক পাহারা বসানো উচিত। থিয়েটারকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল কতকগুলি এলাকা থেকে। আরো একধাপ এগিয়ে এসে সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে পিউরিটানরা বন্ধ করে দিল নাট্যশালার দরজাগুলো। বন্ধদ্বার অবশ্য আবার খুলে গেল রেষ্টোরেশন-এর যুগে। অতঃপর প্রায় শতাব্দকাল নিরংকুশ স্বাধীনতার মুক্ত আবহাওয়ায় ইংরেজী নাটকের চর্চা চলে। আর এই অবধি চর্চার সময়েই ইংরেজী নাটকের শ্রেষ্ঠ ফসল ফলতে দেখা যায়। দীর্ঘস্থায়ী হয় নি এই অবস্থাটা। ১৭৩৭ এর লাইসেন্সিং এ্যাকট-এর মাধ্যমে ওয়াল্‌পোল্ পুনরায় নাট্যনিয়ন্ত্রণের বন্দোবস্ত করলেন। ১৮৬৩-এর থিয়েটারস এ্যাকট অনুযায়ী প্রত্যেকটি নাটককে অভিনয় প্রদর্শনীর পূর্বে লর্ড চেম্বারলেইন্-এর দরবারে পেশ করার বিধি নির্ধারিত হল। প্রয়োজনবোধে যে কোন নাটকের অভিনয়প্রদর্শনী বন্ধ করে দিতে পারবেন লর্ড চেম্বারলেইন, আইনে তাঁকে অধিকার দেওয়া হল।

বহু শ্রেষ্ঠ নাটকের অভিনয় প্রদর্শনীর উপর নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের খড়্গ নেমে এসেছে। ইব্‌সেন-এর গোষ্টস্ ( ১৯১৪ অবধি নিষিদ্ধ ছিল ), ওয়াইল্ড এর সালোম্ ( ১৯৩১ পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল ); এর আগে বার্ণর্ড শ-এর নাটক, গ্রান্‌ভাইল বার্কার এর ওয়েষ্ট এর মত এমনি আরো অনেক নাটকই নিষিদ্ধতার বেড়াজালে আটকা পড়েছে।

বিনা প্রতিবাদে কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে শিরোধার্য ক'রে নেয়নি ওদেশের মানুষ। ইয়েটস্, ব্যারি, গলস্‌ওয়ার্দির মতো নাট্যরসিক মানুষরা গিয়ে এ্যাস্কুইথ্-এর কাছ থেকে নিয়ন্ত্রণাদেশের শিথিল প্রয়োগের প্রতিশ্রুতি আদায় করে এনেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের প্রয়োগ বহুলাংশেই শিথিল করা হয়েছে। অবশেষে এই কিছুদিন আগে নাট্যনিয়ন্ত্রণ রহিত করার জন্য বিল্ আনতে দেখা গেছে ডিংলে ফুটকে। ব্যবস্থা হয়েছে নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলোর অতি সংযত প্রয়োগের। অন্যদিকে অপেশাদার নাট্যাভিনয় সংস্থাগুলো তো আইনের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে নাটক নির্বাচনে তাদের স্বাধীনতাকে প্রায় অক্ষতই রেখে এসেছে।

ইতিহাসের ঘটনাচক্র যেমনই হোক না কেন একথা ঠিক যে শাসকগোষ্ঠী তাদের শ্রেণীস্বার্থ বজায় রাখার জন্য নাটক আর নাট্যাভিনয়ের উপর নিয়ন্ত্রণাদেশ জারি করে এসেছে বরাবর। নাটক



ও মঞ্চ যে জনগণকে জাগ্রত ও সচেতন ক'রে তোলার পথে অত্যন্ত মারাত্মকভাবে শক্তিশালী অস্ত্র একথা শাসকশ্রেণীর না বোঝবার কথা নয়। এই সেদিনও কেনেডি পরিবারের কাহিনী নিয়ে লেখা একটি নাট্যচিত্রের অভিনয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে গণতন্ত্রী মার্কিন দেশে। শিল্পচর্চায় নিরঙ্কুশ অধিকার বিদ্যমান বলে শোনা যায় যে পারী নগরীতে, সেখানকার নাট্যাভিনয়ের উপরও পুলিশের হস্তক্ষেপের দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

ভারতবর্ষে নাট্যনিয়ন্ত্রণবিধির প্রবর্তন ইংরেজ রাজত্বে ইংরেজের তৈরি নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের মাধ্যমে। নাটক ও অভিনয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ নিষেধাজ্ঞা বিভিন্ন দেশে প্রচলিত বটে তবে ইংরেজের কলোনী ভারতবর্ষে সেই আইনের উদ্দেশ্য লক্ষ্য ও প্রকরণ স্বতন্ত্ররূপে দেখা দিয়েছিল। অন্ততপক্ষে ইংরেজের আপন দেশে এই আইনের বিধিবিধান ও প্রয়োগপদ্ধতির সঙ্গে ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে অনুসৃত আইনের বিধিবিধান ও প্রয়োগের গুরুতর পার্থক্য ঘটেছে। এটাই বোধ হয় স্বাভাবিক।

ইংরেজ তার আপন দেশে নাটক আর অভিনয়কে যে সব কারণে সংযত করার প্রয়োজন বোধ করেছিল তা সূচনায় প্রধানত ধর্মীয় আর তার পরের দিকে অনেকটাই শাসকগোষ্ঠীর বিশেষ ধরণের নীতিবোধের দোহাইতে। অপরদিকে তার কলোনী ভারতবর্ষে এই আইন প্রণয়নের প্রয়োজনবোধ এসেছে প্রধানত রাজনৈতিক আর সূক্ষ্মভাবে অর্থনৈতিক কারণে। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ অধিকারে অপ্রতিহত রাখা এবং আর্থিক শোষণের একচেটিয়া ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী করা ইংরেজ শাসনের মূল লক্ষ্য। তাই আইন প্রণয়নের সময় সেদিনের শাসকগোষ্ঠী স্বদেশের সমতুল আইনের নজিরের দোহাই পাড়লেন বটে, কিন্তু এখানে আইনের বিধিবিধানগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের বিশেষ স্বার্থের অনুকূল ক'রে রচনা করলেন আর তাদের প্রয়োগও ঘটাতে থাকলেন ভিন্ন পদ্ধতিতে একান্তভাবে নিজেদের স্বার্থসাধনে।

নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের আওতায় পড়ে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হল বাংলা নাটক। আইনের কবলে পড়ে একটা দেশের সাহিত্যপ্রচেষ্টা যে কী পরিমাণ বিপন্ন বিপর্যস্ত এবং বিপর্যগামী হ'তে পারে তার চরম দৃষ্টান্ত বোধ হয় নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন-নিগৃহীত বাংলা নাটক। বাংলা নাটক তার স্বাভাবিক গতিপথ থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছে; প্রতিহত হয়েছে তার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ। বাংলার জাতীয় নাটক গড়ে উঠতে উঠতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং কৃত্রিম পথে পা বাড়াতে বাধ্য হয়েছে।

এদেশে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থের স্বরূপ, সেই স্বার্থে বাংলা নাটক এবং তার অভিনয় কিভাবে কতোটা আঘাত হেনেছিল যার প্রতিক্রিয়ায় নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন পাশ করতে হল আর সেই আইনের ধারাগুলোর প্রয়োগ বাংলা নাটকের স্বাভাবিক বিকাশের পক্ষে কী পরিমাণ প্রতিবন্ধকতা করেছে এসব প্রসঙ্গ বাংলা নাটকের ধারায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বাংলা নাট্যসাহিত্যের ঐতিহাসিকরা সমুচিত গুরুত্ব আরোপ করেন নি।

এদেশে ইংরেজ শাসনের ভালোমন্দ দুরকম ফলই বর্তেছিল আমরা জানি। সমুদ্র মন্থনের ফলে বিষামৃতের উদ্ভবের মতো। পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার সংস্পর্শে উদ্বুদ্ধ জাগরিত চিত্ত আত্মপ্রকাশ ও প্রসারের সাধনায় মগ্ন হয়েছিল। এ পথে সবরকম বন্ধনমুক্তিই তার কামনা। সাহিত্য, বিশেষ করে

নাটক ও মঞ্চ এই মুক্তির পথে শক্তিশালী বাহন স্বভাবতই একথা মনে হয়েছে সেদিন। মনে হয়েছে মধ্যযুগের ধর্মীয় ও সামাজিক জীর্ণসংস্কার ও কুপ্রথার আবদ্ধতা এই মুক্তিপ্রয়াসের পক্ষে বাধা। ফলতঃ ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের তীব্র আন্দোলন দ্বন্দ্ব বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে সমাজে। আর এই ঘাত-প্রতিঘাতের ফেনায়িত তরঙ্গনীর্ষে যে সব নাটকীয় মুহূর্তের সঞ্চার নাটকে তাকে প্রতিভাত ক'রে সম্ভব-মতো মঞ্চপ্রয়োগের মাধ্যমে সামাজিক কুপ্রথাগুলির কুফল সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলার প্রয়াস দেখা দিয়েছে। নাটকের বিষয়রূপে একে একে নির্বাচিত হয়েছে কৌলিন্যের কুফল, বহু বিবাহের ঘৃণ্য বেসাতি, বৈধব্যের করুণ ব্যর্থতা, নব্য পন্থীর অন্ধ অনুকরণমত্ততা, প্রবীণ ভণ্ড তপস্বীর নির্লজ্জ লাম্পট্য ইত্যাদি সমসাময়িক সামাজিক সমস্যাকেন্দ্রগুলি।

ইংরেজের শাসনাধীনে থেকেই সর্বাঙ্গীন মুক্তি সম্ভব এ বিশ্বাসের উপরে ভর যতোদিন ছিল ততোক্ষণ প্রতিবাদ চলেছে প্রধানত সামাজিক বন্ধনের বিরুদ্ধে। জমিদারের অত্যাচারে হৃতসর্বস্ব প্রজা সুবিচারের আশায় কোম্পানীর দরবারের দিকে তাকিয়ে প্রতীক্ষা করে তখন। "রাইৎ বেচারীগো জানে মারো, তাগোর সব লুটে নিয়ে, তার পরে এই করে" অর্থাৎ তাদের বাড়ীর বউকে বার করে নিয়ে যায়। বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ-র হানিফ্ একথা মর্মে মর্মে জানে তবু আশা করে থাকে 'আচ্ছা দেখি, এ কুম্পানির মুলুকে এন্‌ছাফ্ আছে কি না।'

এ পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে অচিরেই। মোহ ভাঙ্গতে বিলম্ব হয় নি। জমিদারীর চিরস্থায়ী স্বত্বের সুযোগে প্রজাশোষণের অবাধ অধিকারপ্রাপ্ত যে জমিদারগোষ্ঠীকে ইংরেজ শাসক তাঁদের আশ্রয়ে গড়ে তুলেছিলেন, নায়েব গোমস্তা আর অসংখ্যরকমের মধ্যস্বত্বভোগীদের উপর প্রজাপালনের দায় অর্পণ করে তাঁদের অধিকাংশই শহরবাসী হয়ে বিলাসে ব্যসনে দিনযাপন সুরু করেছেন। অন্যদিকে অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে গ্রাম্যকুটীর শিল্পের বিপর্যয়ে বংশগত বৃত্তিচ্যুত অগণিত গ্রামীণ মানুষ চরম দারিদ্রের মধ্যে গিয়ে পড়ছে। শহরমুখী হয়ে ছুটে এসেছে তাদের অনেক। ইংরেজের শাসন শোষণ বজায় রাখার কাজে নিযুক্ত নূতন বৃত্তিধারী কেরানীকুল গড়ে উঠেছে। নূতন অর্থ নৈতিক বিন্যাস আর তার ফলে শোষণ ও নিপীড়নের নূতন নূতন পদ্ধতি দেখা দিয়েছে।

একদিকে নূতন কেঁপে ওঠা কলকাতাশহর। অন্যদিকে সীমাহীন দারিদ্র আর মর্মান্তিক শোষণে অন্তঃসারশূন্য গ্রামীণ বাংলাদেশ আর সেখানকার অগণিত অবহেলিত মানুষ। নূতন উপদ্রব দেখা দিয়েছে তার উপর। বাণিজ্যিক ক্রিয়াকর্মের নূতন পথে আর একদিকথেকে শাসকশ্রেণীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে গ্রামে গঞ্জে। নীল ও চায়ের ব্যবসা সূত্রে নীলকুঠি চাবাগিচা আর সেই সঙ্গে গড়ে উঠেছে শ্বেত জমিদারী। শ্বেত জমিদারদের বীভৎস অত্যাচারে ডুবে গেছে গ্রামের মানুষ। এই শ্বেতজমিদারের খাসপ্রজা তোরাপ তার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতায় তাই আর 'কুম্পানীর মুলুকে' কোম্পানির প্রতিভূদের কাছে 'ইনসাফ'-এর প্রত্যাশায় অপেক্ষা করতে পারে নি। ক্ষোভ মিটিয়েছে অত্যাচারী লম্পট নীলকুঠির ছোট সাহেবের নাকটা ছিঁড়ে নিয়ে।

মুক্তিকামী যে মন একদা সামাজিক কুপ্রথার বন্ধন থেকে মুক্তিপ্রয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিল নিজেকে ক্রমে সে তার লক্ষ্যকে প্রসারিত করেছে। রাজনৈতিক শৃঙ্খলের বিরুদ্ধে যন্ত্রণাময় কাতরোক্তি



ক্রমে সহিংস বিদ্রোহ প্রয়াসের পথে স্বাধীনতা অর্জনের দিকে অগ্রসর হয়ে গেছে। গ্রামীণ মানুষের শোষণ ও দারিদ্র্যের চিত্র বাস্তবতায় তুলে ধরতে গিয়ে আধিক অসাম্য ও একচেটিয়া বাণিজ্যিক শোষণের প্রসঙ্গও দেখা দিতে সুরু করেছে নাটকে। সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদও দানা বেঁধে উঠতে সুরু করেছে দর্শক ও পাঠক মনে। এসবই শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থের প্রতিকূল। তাই সে তার নখদন্তবিস্তারে কার্পণ্য করে নি। একের পর এক আইনের বিধিনিষেধ আরোপ করে ব্যাহত করেছে মুক্তিপ্রয়াসকে।

বাংলা সাহিত্যে অপরাপর শাখার তুলনায় নাটকই প্রথম থেকে স্বাভাবিকভাবে সমাজ-সচেতনতার পথে সমধিক অগ্রসর ছিল। সামাজিক কুপ্রথার কুফল প্রদর্শনের প্রচেষ্টা প্রথম পর্বের নাটকে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। কৃষ্ণকুমারী নাটকে ভীমসিংহের ধেদোক্তিতে পরাধীনতার বেদনা প্রকাশে রাজনৈতিক সচেতনতার অভিব্যক্তি ঘটল। এই চেতনার সম্প্রসারণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুরুবিক্রম সরোজিনীতে। আর বিদেশী শাসনের উচ্ছেদের জন্য সশস্ত্র বিদ্রোহাত্মক চেষ্টার ইঙ্গিত বয়ে আনল উপেন্দ্রনাথ দাসের শরৎ সরোজিনী, সুরেন্দ্র বিনোদিনী প্রভৃতি নাটক। ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ এক নতুন দিগন্তকে উন্মোচিত করে দিয়েছে নীলদর্পণ নাটক।

নীলদর্পণের পটভূমি নীলচাষের অন্তর্ভুক্ত গ্রামবাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। ইংরেজের কলোনী ভারতবর্ষে সেদিন দিশি মূলধনের বিনিয়োগের মাধ্যমে বৃটিশ মূলধনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামা সম্ভবপর ছিল না। মুক্তিচেতনা যেদিন আর্থিক ক্ষেত্রকেও স্পর্শ করতে চাইল তখন সেই মুক্তি বাসনাকে তাই সংযত ও সীমিত রাখতে হল শুধুমাত্র একচেটিয়া পুঁজির মুনফার লোভের ফলে শোষিত মানুষের দুঃখ দারিদ্র্য আর অসহায়ত্বের করুণ ছবি এঁকে তোলার মধ্যে। নির্মম অত্যাচারের করুণ চিত্র আর এই শোষণের বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধের ক্ষিপ্ত পরিণামে বিপর্যয়ের কাহিনী নিয়ে নীলদর্পণের আবির্ভাব।

নীলদর্পণ সরাসরি আঘাত হানল ইংরেজের আর্থিক স্বার্থে। এই পরিস্থিতিতে শাসকগোষ্ঠী সতর্ক না হয়ে পারে না। তার উপর নীলদর্পণের আদর্শে অতি অল্পকালের মধ্যে লেখা হলো পর পর অনেকগুলি 'দর্পণ' নাটক। পল্লীজীবনের দুরবস্থার কাহিনী নিয়ে পল্লীগ্রাম দর্পণ, গ্রাম্য জমিদারের অত্যাচারের কাহিনীচিত্র কেরাণীদর্পণ, জেলখানায় কয়েদীদের উপর অত্যাচারের চিত্র সমন্বিত জেল দর্পণ আর চাবাগিচার মালিক ইংরেজ কর্তাদের দ্বারা কুলীদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচারের নাট্যরূপ চা-কর দর্পণ একে একে আবির্ভূত হল। ইংরেজ শাসনাধীন বাংলাদেশের সমাজের ও জীবনের নানা অঞ্চলের বাস্তব চেহারাটা তুলে ধরেছে এই নাটকগুলি। উদ্দেশ্য অবশ্যই মানুষকে সচেতন করে তোলা—প্রতিবাদের বিক্ষোভের পথে ঠেলে দেওয়া; নীলদর্পণের প্রকাশ যেমন ভাবে একদিন বাংলাদেশের মানুষকে সচেতন এবং প্রতিবাদে মুখর করে তুলেছিল নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের ভয়াবহতা সম্পর্কে।

লক্ষ্য করার বিষয়, এই নাটকগুলির সাক্ষাৎ প্রেরণাস্থল নীলদর্পণ নাটক সন্দেহ নেই, তবে সে সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত নীলদর্পণ। নীলদর্পণের রচনাকাল ও সাধারণ রঙ্গালয়ে তার মঞ্চায়নের মধ্যে 'বার বছরের' ব্যবধান। ন্যাশনাল থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটিত হল নীলদর্পণের অভিনয় দিয়ে

১৮৭২ সালে। আর এই দর্পণ নাটকগুলির রচনাকাল হল ১৮৭৩ থেকে ১৮৭৫-এর মধ্যবর্তী সময়।

নাটকের বিষয় ও বক্তব্যকে জনমনে পৌঁছে দেবার জন্য প্রয়োজন নাট্যশালার। কলকাতার বড়মানুষদের বাড়ীতে তাঁদের পরিচালিত মঞ্চে তাঁদের মজ্জিমাফিক নাটকেরই অভিনয় হবে। সেখানে নাটক বা অভিনেতার নির্বিশেষ প্রবেশাধিকার নিশ্চয়ই থাকবার কথা না ;—ছিলও না। কাজেই প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল এমন নাট্যশালার যেখানে নির্বিশেষে নাটক, অভিনেতা ও দর্শকদের জায়গা মিলবে ; নিয়মিত অভিনয়ের ব্যবস্থা থাকায় নাটক রচনার প্রেরণাও বাড়বে। নাটক সেদিন অবধি সমাজ সচেতনতার যে ঈপ্সিত পথে প্রাগ্রসর তাতে আশা করার সঙ্গত কারণ ছিল যে জাতীয় নাট্যশালার প্রশ্রয় পেলে নাটক সহজেই জনগণমনে তার বক্তব্যকে পৌঁছে দিতে পারবে। এইসব আশা ও আগ্রহের সমর্থন নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হল ন্যাশনাল থিয়েটার। বাংলাদেশের নাট্যমঞ্চের ক্ষেত্রে ঘটল নবযুগের অভ্যুদয়। বড় লোকের বাড়ীর ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে মুক্ত হয়ে থিয়েটার সাধারণের দ্বারে এসে দাঁড়াল। মঞ্চমালিকের মর্জির উপর নির্ভর না করে টিকিটের বিনিময়ে সাধারণের প্রবেশাধিকার স্বীকৃত হল। উদ্যোক্তাদের মধ্যে অধিকাংশই এলেন সাধারণ মধ্যবিত্ত-স্তরের যুবকসম্প্রদায়। অভিনীত হল নীলদর্পণ নাটক—অজ্ঞাত গ্রামীণ মানুষের উপর ইংরেজের বাণিজ্যিক শোষণের নির্মম চিত্র আর তার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিরোধের কাহিনী। ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে দর্শক নীলদর্পণের অভিনয় দেখলেন সাধারণ রঙ্গমঞ্চ—ন্যাশনাল থিয়েটারে। অন্যদিকে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীও একই সঙ্গে শঙ্কিত ও সতর্ক হয়ে উঠল। কেমন করে এহেন মঞ্চপ্রয়াসকে বন্ধ করা যায় তার সুযোগ খুঁজতে থাকল শাসক সম্প্রদায়।

ক্ষীণায়ু ন্যাশনাল থিয়েটারের দরজা অচিরেই বন্ধ হল বটে কিন্তু এই আদর্শে গড়ে উঠল একাধিক সাধারণ রঙ্গমঞ্চ। এইসব মঞ্চের আশ্রয়ে নাটক আর তার বক্তব্য পৌঁছে যেতে থাকল নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের কাছে। ১৮৭২ থেকে সাধারণ মঞ্চে অভিনীত নাটকের তালিকার দিকে দৃষ্টি ফেলে দেখা যাবে যেসব নাটক অভিনীত হয়েছে তাদের অধিকাংশই জাতীয় মুক্তি বাসনার রূপায়নে প্রয়াসী। অধিকাংশ নাটকই ইংরেজ শাসন আর শোষণের প্রকৃত রূপকে কোন না কোন ভাবে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছে। ইংরেজ শাসনের ন্যায্যতা সম্পর্কে প্রশ্নমনস্ক করে তুলেছে দর্শককে। শাসকগোষ্ঠীর আতঙ্কিত হয়ে ওঠার পক্ষে এইটাই যথেষ্ট ছিল। সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন তাঁরা। অবশেষে অন্তিম আঘাত এলো সম্ভবত চা-কর দর্পণ-এর মতো নাটক প্রকাশিত হওয়ায়।

সূচনায় চা-কর সাহেব কর্তৃক কুলী রমনী ধর্ষণের লিখোছবিসহ চা-কুলীদের উপর চা-কুঠীর শ্বেতাঙ্গ কর্তাদের পাশব অত্যাচারের কাহিনী সমন্বিত চা-কর দর্পণ প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ সালে। লোকদৃষ্টির অন্তরালবর্তী চায়ের বাগানের চা-শ্রমিকদের জীবনে যে অমানুষিক অত্যাচার নিত্য অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে সাহেব মালিকদের দ্বারা তার বাস্তব চিত্র এঁকে প্রকৃত অবস্থাটা ফাঁস করে দিল এই নাটক। এ নাটকও নীলদর্পণের আদর্শেই রচিত। নীলদর্পণ নীলের ব্যবসায়ে প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছিল। কৃত্রিম উপায়ে নীল তৈরির উপায় উদ্ভাবিত হওয়ায় সে ব্যবসা না হয় গুটিয়ে ফেলতে হয়েছে। কিন্তু বৃটিশ মূলধনের একটা বড় অংশ যে তখন লগ্নীকৃত চায়ের ব্যবসায়। আর এই একচেটিয়া ব্যবসাতে লাভের অঙ্কও যে অনেক বেশি। বাজারও প্রায় পৃথিবী জুড়ে। এ ব্যবসাও যদি



বিরুদ্ধ আন্দোলনের ফলে গুটিয়ে ফেলতে হয় তাহলে শোষণের মাধ্যমে শাসন কায়েম রাখাটাই অসম্ভব ব্যাপার হয়ে উঠবে। চা-কর দর্পণ তখনো মঞ্চস্থ হয় নি যদিও তবু সাধারণ রঙ্গালয়ে যে কোনদিন তার আশ্রয় জুটে যাওয়ার সম্ভাবনা। তার আগেই ব্যবস্থাগ্রহণ বিধেয়। অতএব নাট্য নিয়ন্ত্রণ অর্ডন্যান্স জারী করতে হল (২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৬) এবং বহু প্রতিবাদ ও প্রতিবেদনকে অগ্রাহ্য করে কালক্ষেপ না করে অবিলম্বে নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ করে নেওয়া হল ( ১৭ই ডিসেম্বর, ১৮৭৬ )। ছোটলাট অ্যাসলে ইডনের পক্ষ থেকে এই আইনের সংযত প্রয়োগের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও অচিরেই ( ৪ঠা মার্চ, ১৮৭৬ ) এই আইনের খড়্গ নেমে এসেছিল নাটক ও নাট্যশালার উপর।

একথা ঠিক যে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে 'গজদানন্দ' ও 'Police of Pig and Sheep' এর অভিনয় ( ১লা মার্চ, ১৮৭৬ ) উপলক্ষ্যে নাট্যনিয়ন্ত্রণ অর্ডন্যান্সের প্রথম প্রয়োগ ঘটেছিল। সুরেন্দ্র-বিনোদিনী অশ্লীলতার দোহাইতে অভিযুক্ত হয়েছিল। থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত নাট্যকার, অভিনেতা, মঞ্চাধ্যক্ষকে গ্রেপ্তার করা হল, বিচারে উপেন্দ্রনাথ দাস ও অমৃতলাল বসুর সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান দেওয়া হল। আবার হাইকোর্টের বিচারে অভিযোগ টিকল না বলে এঁরা মুক্তিও পেলেন। এই প্রহসনের সবটাই ঘটে গেল সুরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটকের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগকে কেন্দ্র করে। একটু তলিয়ে দেখলেই কিন্তু বোঝা যাবে সাহিত্যে শ্লীলতা অশ্লীলতার ব্যাপারে শাসকগোষ্ঠীর আদৌ কোন শিরঃপীড়া ছিল না। কারণ এদেশে মুদ্রাযন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বহু অশ্লীলধরণের বই ছাপা ও বিক্রি আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। ১৮১৯-২০ সনের School Book Society-র তৃতীয় বার্ষিক রিপোর্টে পূর্ববর্তী পনের বছরে প্রকাশিত মুদ্রিত বই সম্পর্কে মন্তব্য ছিল—'Not a few are distinguished only by flagrance violation of common decency ; and are too gross to admit of their attempts to be disclosed before the public eye. এর পর স্বভাবতই পত্রপত্রিকায় আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে থাকে। দাবী ওঠে অশ্লীল পুস্তকাদি প্রকাশের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের। কর্তৃপক্ষ কিন্তু এই দাবীতে সাড়া দিয়ে আইন প্রণয়নের প্রয়োজন বোধ করেন নি সেদিন। অথচ নাট্যশালার উপরে পুলিশের হস্তক্ষেপ ও শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বেলায় সেই অশ্লীলতার অভিযোগই আনলেন তাঁরা। আসলে সুরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে পুলিশের রিপোর্টে যা বলা হয়েছিল সেইটাই শাসকগোষ্ঠীকে চঞ্চল করে তুলেছিল। নাটকে বর্ণিত ম্যাজিষ্ট্রেটের পাশবিক অত্যাচারের ফলে নারীর সর্বনাশের ঘটনা, ইংরেজের জেলখানা ভেঙে বেরিয়ে আসার প্রসঙ্গ প্রভৃতির ভিতর দিয়ে ইংরেজের বিচার ব্যবস্থার প্রকৃত চেহারা ফাঁস করে দেওয়া এবং ইংরেজবিরোধী মনোভাবকে তীব্র করে তোলার যে প্রচেষ্টা সুরেন্দ্র-বিনোদিনীতে ছিল পুলিশ সে সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে দিতে ভোলে নি। জনমানসের স্বাস্থ্যরক্ষার দায়েই যেন সুশাসকের মতো তাঁরা অশ্লীলতার অভিযোগ এনেছেন এটা ছিল লোকদেখানো মুখোস। এ অভিযোগ যে টিকতে পারে না একথাও তাঁরা জানতেন। সেইজন্য পুনর্বিচারের জন্য হাইকোর্টে মামলা ওঠে যেদিন ( ২০শে মার্চ, ১৮৭৬ ) ঠিক সেই দিনই মামলার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা না করেই অশোভন ব্যস্ততার সঙ্গে কাউন্সিলে নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল উপস্থাপিত করেন কাউন্সিলের ল' মেম্বার হবহাউস সাহেব। সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর মূল উদ্দেশ্য যে শাসন ও শোষণকে কায়েম রাখা যে কোন প্রকারে শ্লীলতা

অশ্লীলতার বিচার বিবেচনায় আদৌ কোন মাথাব্যথা তাঁদের যে ছিল না তার সমর্থন মিলবে নাট্য-নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ হয়ে যাওয়ার পর কিছুদিনের ব্যবধানে প্রকাশিত ( ২৮ মে, ১৮৭৭ ) সমাচার চন্দ্রিকার মন্তব্যটি পড়লে—

'হবহাউসের এত সাধের নাট্যাভিনয় আইন বিধিবদ্ধ হইয়া কী হইল? নাট্যাভিনয় আইনের একটি ধারায় লিখিত আছে; অশ্লীল, নিন্দাজনক অথবা অপবাদজনক কোন নাটক কিম্বা প্রহসনের অভিনয় করিলে নাট্যশালার অধ্যক্ষ, অভিনেতৃ এবং দর্শকগণ দণ্ডার্হ হইবেন। বঙ্গ রঙ্গভূমিতে ( ১৬ই মে ১৮৭৭ এ বেঙ্গল থিয়েটারে ) 'আয় ঘুরে আয় নদের চাঁদ' প্রহসনখানি কি এই শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট নহে? আমরা আশ্চর্য হইলাম যে পুলিশের অন্যতম সুযোগ্য ইন্সপেক্টর বাবু সর্বানন্দ রায় তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি উপস্থিত থাকিয়া যে এ প্রকার অশ্লীল প্রহসনের অভিনয় দেখিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া চলিয়া আসিলেন ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়।'

নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের সমর্থনে এর প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দেবার জন্য বিলের উত্থাপক হবহাউস আপত্তিজনক নাটকের দৃষ্টান্ত হিসেবে 'গজদানন্দ' প্রহসনের উল্লেখ করে কাউন্সিলের সদস্যদের বললেন—

···'a highly respectable Hindu gentleman of good position in society, one of the legal advisers of Government, and one of the members of the legislature of Bengal'—এর ছবি প্রহসনটিতে এমনভাবে আঁকা হয়েছে যে তিনি যেন 'deliberately selling his own honour and that of his family in order to get promotion and money.' সেদিনের জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় সপ্তম এডওয়ার্ডকে যেভাবে তাঁর বাড়ীতে আপ্যায়ন করেছিলেন সে সম্পর্কে হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা লিখলেন—'ইনি যে মূল্যে রাজসম্মান ক্রয় করিলেন, তাহাতে সমস্ত জাতির সম্ভ্রম আজ পদদলিত হইয়াছে।' অমৃতবাজার মন্তব্য করলেন —'যে পাষণ্ড নিজ পরিবারের মর্যাদা এই ভাবে ধূলিসাৎ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না, সে দেশের জাতির ও সমাজের ব্যাধিস্বরূপ ঘোর কলঙ্ক।' 'গজদানন্দ' প্রহসনে এই জনমতেরই প্রকাশ ঘটান হয়েছিল, তার বেশি কিছু নয়। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই জগদানন্দের মতো আশ্রিতজনের রক্ষণাবেক্ষণের কথা শাসকগোষ্ঠীকে ভাবতে হয়েছে। নাগরিকের জীবন নিবিঘ্ন ও সম্মানজনক করে তোলার যে দায় সুশাসকের তার জন্য মোটেই নয়। যদিও হবহাউস তাঁর বক্তৃতায় ইংরেজ শাসনের নিরপেক্ষতা ও সমদর্শিতা বিষয়ে একটা মোহজাল বিস্তার করতে চেয়েছিলেন। কিছুটা সফলও হয়েছিলেন ইণ্ডিয়ান মিরর প্রভৃতি দু' একটি পত্রিকাকে দলে টানতে পেরে।

হবহাউস তথা শাসকগোষ্ঠীর আসল উদ্দেশ্য কিন্তু বেরিয়ে পড়েছে হবহাউসের বক্তৃতার পরবর্তী অংশে। তিনি জানেন খুব ভালো করেই সর্বকালে সর্বদেশে জনগণমনে নাটক ও মঞ্চের দুর্বার প্রভাবের কথা। ···in all times and countries the drama has been found to be one of the strongest stimulants that can be applied to the passions of men'—একথা বলে তিনি স্বীকার করে নিলেন বাংলা নাটকের অস্তিত্বও ঠিক এই ভাবেই শাণিত হয়ে উঠেছে এবং উদ্যত হয়ে উঠেছে চরম আঘাত হানবার জন্য। হবহাউসের নিজের ভাষায়—'···to excite



feeling of disaffcetion to the Crout।' বাংলা নাটকের তদানীন্তন আশা ও আদর্শ সম্পর্কে পুরো ওয়াকিবহাল তাঁরা। জানেন—'The Dramatic literature of Bengal was in a very rising and promising condition, If greatly exercised the thought and imaginative faculties of the people। অতএব অঘটন, লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণরের ভাষায় 'serious mischief' ঘটে যাওয়ার আগেই আইনের বেড়া তুলে দেওয়ার প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে উঠল নাটক ও নাট্যশালার সামনে।

এই 'serious mischief' অর্থাৎ চরম সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে শাসকগোষ্ঠী জানেন যদি তাঁদের বাণিজ্যিক স্বার্থে আঘাত আসে, শোষণের পথগুলো যদি বন্ধ হয়ে যায়। সে আশঙ্কার ঝড়ো মেঘ হবহাউস দেখতে পেলেন চা-কর দর্পণ নাটকে। চা-কর দর্পণ তখনো অভিনীত হয় নি। কিন্তু তাঁর কাছে গোপন রিপোর্ট আছে যে এই নাটকে এমন কিছু আছে যা চায়ের ব্যবসার মালিকদের মুখোস খুলে দিয়েছে একেবারে নগ্নভাবে। কাউন্সিলের সদস্যদের তিনি যা বললেন তাঁর নিজের ভাষাতেই শোনা যাক—

There was composed a work in dramatic form called the Cha-Ka-Darpan, ( 'চা-কর দর্পণ' নামটি ঠিকভাবে বলতে পারেন নি দেখা যাচ্ছে ) which I am told means the mirror of Tea, I do not know who was the auother or what his motives were, but the work itself was as gross a calumny as it was possible to concieve. The object was to exhibit as monster of inequity the tea planters and those who were engaged in promoting emigration to the districts—bodies of men as well conducted as any in the Empire।' তারপর আত্মগোপন সমর্থনের ভঙ্গিতে ছলনাময় উক্তি করলেন—'These gentlemen who are carrying on the business to the benifit of everybody concerned, and perhaps with a greater proportion of benifit to the labourers they employ than to anybody else, have what is called a Mirror held up to them in which the gratification of vile passions, cruelty, avarice and lust, is presented as there ordinary occupation·····'*

এই চা-কর দর্পণ নাটক যদি একবার পাদপ্রদীপের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে জনসমক্ষে এসে উপস্থিত হতে পারে তাহলে হবহাউসের মত বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষে অনুমান করা শক্ত নয় মোটেই যে চায়ের ব্যবসায়ের উপর প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়বে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে সুরেন্দ্র বিনোদিনীর তথাকথিত অশ্লীলতা নয়, আরোপিত অভিযোগে অভিযুক্ত গজদানন্দ প্রহসনও নয়, তার থেকে অনেক বেশী অধীর হ'য়ে উঠেছিলেন শাসক সম্প্রদায়

*হবহাউস-এর উক্তিগুলো India Grazette, Oct—Dec, 1876 এর Abstract from the proceedings of the Council of Governor General of India থেকে উদ্ধৃত।

সেদিন চা-কর দর্পণ নাটকের অনুপ্রেরণা তাঁদের ব্যবসায়িক স্বার্থের প্রতি চরম আঘাতের সম্ভাব্যতায়। আর তাই সমস্ত আবেদন নিবেদন অগ্রাহ্য ক'রে নাট্যনিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় নেমেছিলেন।

একান্তভাবে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার্থে প্রণীত হল নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন। এর লক্ষ্য হ'য়ে উঠল স্বভাবতই উদীয়মান নাটক আর নাট্যশালার স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশকে প্রতিহত ক'রে তাকে বিপথগামী হ'তে বাধ্য করা এবং ফলতঃ পঙ্গু করে তোলা।

এমন আটঘাট বেঁধে নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনটি করা হয়েছিল যে এর থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় ছিল না কারো কোনদিক থেকে। ইংরেজের আপন দেশে অনুরূপ আইনের বিধিতে যেখানে আছে 'Royal Letters Patent' অথবা 'Lord chamberlains Licence' কিম্বা 'Licence given by Justice of peace' ছাড়া কোন ব্যক্তি কোন স্থান নাট্যাভিনয়ের জন্য নির্দিষ্ট ক'রে রাখতে পারবে না; এখানে সেই জায়গায় বলা হল 'Whenever the Provincail Govt is of opinion that any play, pantomime or other drama performed or about to be performed in a public place is—

(a) of a scandalous or defamatory in nature, or

(b) likely to excite feelings of disaffcetion to the Govermenent established by law in British India [ or British Burma ] or,

(c) likely to deprave and corrupt persons present at the performance* নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের প্রয়োগে তাদের নিষিদ্ধ করা হবে। এখানে নিষেধাজ্ঞা নেমে এল নাটকের উপরে। Any building or enclosure to which the public are admitted to witness performances on payment of money'—'public place' এর এই ব্যাখ্যার সাহায্যে টিকিট বিক্রি করে যে সব মঞ্চ অভিনয়ের আয়োজন করছিল অর্থাৎ সেদিনের সমস্ত পাবলিক থিয়েটারকেই এই আইনের আওতায় এনে ফেলা হল। অভিনয়ের জন্য মনোনীত প্রত্যেকটি নাটককে অভিনয়ের আগে অনুমতিসাপেক্ষে পুলিশের কাছে পেশ করার বিধি হল। যদি অননুমোদিত হয় কোন নাটক আর তা সত্ত্বেও সেই নাটকের অভিনয়ের আয়োজন করা হয় তাহলে নাটক বা নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে যে কোনভাবে যুক্ত অভিনেতা, নির্দেশক, মঞ্চাধ্যক্ষ, নাট্যগৃহের মালিক বা নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তির কাছে কৈফিয়ৎ তলব করা যাবে এবং বিধিলঙ্ঘন করা হয়েছে মনে হলে তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তার জরিমানা জেল প্রভৃতির ব্যবস্থা করা যাবে।

সুরেন্দ্র বিনোদিনীর মামলায় জড়িয়ে পড়ে সর্বস্বান্ত থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী ভুবনমোহন নিয়োগী থিয়েটারের সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ করে দূরে সরে গেলেন। নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাস পাড়ি দিলেন বিলেতে। ম্যানেজার অমৃত বসু তাঁর অনুগামী হতে গিয়ে বাধা পেলেন বাড়ী থেকে; চলে গেলেন আন্দামানে। অভিনেতা বিহারীলাল পুলিসের চাকরী নিয়ে চলে গেলেন পোর্টব্লেয়ারে। অভিনেত্রী সুকুমার দত্ত থিয়েটার ছেড়ে বাড়ী বসে রইলেন আর অর্ধেন্দু মুস্তাফী বেরিয়ে পড়লেন দেশভ্রমণে।

*Section 3 of the Dramatic Proformances Act 1876.



এর পর নিশ্চয়ই আর কেউ সাহস করে এগিয়ে আসবেন না এমন নাটকের অভিনয়ে আয়োজন করতে যে নাটকে জাতীয় জীবনের সামান্যতম আশা বাসনার প্রতিফলন ঘটেছে।

আইনে আরো যেন চোখ রাঙিয়ে বলা হল আইন বিরুদ্ধ কোন নাটকের অভিনয় হতে থাকলে পুলিশ প্রয়োজনবোধে বলপূর্বক সেখানে ঢুকে গ্রেপ্তার করা ছাড়াও সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ক'রে নিতে পারবে। অতঃপর নিশ্চয়ই কোন মঞ্চাধ্যক্ষ আদৌ সাহসী হবেন না এমন কোন নাটক নির্বাচন করতে যা পুলিশের বিচারে নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হ'য়েছে বা হ'তে পারে।

সব থেকে মারাত্মক যে ধারাটি এই আইনে সংযোজিত, যার নজীর আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না তা হল নিষিদ্ধ অভিনয়ের ক্ষেত্রে দর্শকদেরও শাস্তিযোগ্য বলে ঘোষণা করা।

পাবলিক থিয়েটারের যুগে যেখানে দর্শকের পয়সায় থিয়েটার চলে সেখানে দর্শকের সামনে এই আতঙ্ককে তুলে ধরাটা খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল সন্দেহ নেই।

এইভাবে নাট্যকার থেকে শুরু করে দর্শক অবধি সবাইকে আইনের আওতায় এনে নাটক আর নাট্যশালাকে কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যে এনে ফেলেছিল সেদিনের শাসক সম্প্রদায়। এর পর কে ঝুঁকি নেবে জাতীয় চেতনামূলক নাটকের অভিনয়ের আয়োজন করতে বা তা দেখতে।

যে উদ্দেশ্যে এই আইন বিধিবদ্ধ হয়েছিল তা সিদ্ধ হল। সমগ্র নাট্যজগতে একটা দিশেহারা অচল অবস্থার সৃষ্টি হল। শৌখিন অভিনেতাদের হাত থেকে মঞ্চ আস্তে আস্তে ব্যবসাদারের হাতে গিয়ে পড়ল এই সুযোগে। পয়সা রোজগারের উদ্দেশ্যে যেখানে নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করছেন ব্যবসায়ী মঞ্চ মালিকেরা স্বভাবতই তাঁরা আইনের চোখে নির্দোষ নাটককেই বেছে নিতে লাগলেন।

এই ছন্নছাড়া অবস্থায় পড়ে গীতিনাটক ছাড়া অন্য কোনপ্রকার নাটকের অভিনয় করার সাহস হল না কারো। জীবনঘনিষ্ঠ নাটকের জায়গায় স্থান নিল আদর্শসতী, পারিজাত হরণ এর মতো অসার গীতনাট্যের অভিনয়। যে ভুবনমোহন সুরেন্দ্র বিনোদিনীর অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন তিনিই আবার ওই পারিজাতহরণ গীতিনাটকের মঞ্চায়ন ঘটালেন। অভিনয় দেখে হতাশ গিরিশচন্দ্র গান লিখলেন—

'আমায় ফিরিয়ে দে না আধুলি
কি ঠকানটা ঠকালি।'

সত্যিই নাটক ও মঞ্চ সেদিন আত্মবঞ্চনার পথে নেমে যেতে বাধ্য হয়েছিল। নাচগানের পসরা সাজানো গীতনাট্য, পঞ্চরং তামাসা আর বাস্তব জীবন থেকে অনেক পেছন ফেরা পৌরাণিক যুগ ও জীবনের আখ্যান নিয়ে লেখা পৌরাণিক নাটকের মাধ্যমে ভক্তিরসের বন্যাস্রোত নেমে এল মঞ্চে। প্রহসনের সামাজিক স্পর্শ হারিয়ে গেল। নাটক তার বলিষ্ঠ জীবনাবেগ হারিয়ে ফেলল।

নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের শেষ ধারায় ছিল—'Nothing in this Act applies to any Jatras or performances of or like kind at religious festivals.' যাত্রা ও তার সমধর্মী অভিনয় অনুষ্ঠানের প্রতি এই আইনের বিধিনিষেধ প্রযুক্ত হবে না এই অঙ্গীকার পৌরাণিক আধারে ভক্তিধর্মের প্রবাহকে নিয়ে আসতে নিশ্চয়ই অনেকখানি উৎসাহ যুগিয়েছিল।

কলকাতায় অবস্থিত বিদেশী মঞ্চের অনুকরণে এদেশের মঞ্চ গড়া হয়েছিল। ন্যাশনাল থিয়েটারের মঞ্চও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে যেহেতু মঞ্চপ্রকৃতি ও নাট্যপ্রকৃতি পরস্পরসাপেক্ষ, একে

অন্যের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়; শক্তিশালী নাটকের প্রভাবে তাই মঞ্চরূপের পরিবর্তনও অসম্ভব ছিল না। মঞ্চ যেদিন বড় মানুষের ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে বেরিয়ে এসে ন্যাশনাল থিয়েটাররূপে সাধারণের দ্বারে এসে দাঁড়াল সেদিন এ সম্ভাবনাও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। প্রয়োজন সেদিন জীবন-ঘনিষ্ঠ বলিষ্ঠ নাটকের যা তার আপন প্রয়োজন অনুযায়ী মঞ্চরূপকে পরিবর্তিত করে দিতে সক্ষম। নিয়ন্ত্রণ আইনের শিকল পরে নাটক ও মঞ্চকে সেদিন যে পথে চলতে দেখা গেল তাতে সে সম্ভাবনা সুদূরে মিলিয়ে গেল। মঞ্চপ্রকৃতিকে রূপান্তর ঘটাতে পারে এমন নাটক মঞ্চস্থ হয় না বরং ভাল নাটকের অভাবটাকে পুষিয়ে দেবার জন্য ব্যবসাদার মঞ্চ-মালিকরা মঞ্চের বিলিতি ছাঁদকে অক্ষুণ্ণ রেখে তার উপর মঞ্চমায়া ও কুহক সৃষ্টির প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েন। নাটক ও মঞ্চে ব্যবধান ঘুচে গিয়ে ন্যাশনাল থিয়েটার যথার্থ জাতীয় মঞ্চ হয়ে উঠতে পারত, সে সম্ভাবনা দেখাও গিয়েছিল, যদি নাটক ও মঞ্চের স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ ব্যাহত না হত আইনের নাগপাশে পড়ে। মঞ্চ ও নাটকের প্রকৃতিতে যে ব্যবধানের সূচনা হয়েছিল সেদিন আজও তা মুছে গেছে সম্পূর্ণভাবে একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় না। ন্যাশনাল থিয়েটারের যাত্রারম্ভে আইনের অপঘাত তাকে পঙ্গু করে তুলেছিল। সত্যিকার ন্যাশনাল থিয়েটার বা জাতীয় মঞ্চ আজও আমাদের কল্পনার বস্তুই হয়ে আছে।

নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন বাংলা নাটক আর নাট্যশালার যে পরিমাণ ক্ষতিসাধন করেছে আর কোন দেশের কোন আইন তা করতে পেরেছে বলে মনে হয় না।

# বিক্রমপুরের আটপৌরে ভাষা

ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

রান্না হয় নাই বুঝি।

না, বাজারে দেরী হইছিল। পরের হাতে ধন, পরের পায় গমন, নিজের ইচ্ছামত কাজ হয় না।

নাও আমাগোও নাই, তবে নি নাইয়ার শতেক নাউ। বাজার থেকা কি আনছে?

আমাগো আবার বাজার। পুঁটি মাছ পিটালি আঁধার। তোমার কথায় মনে পড়ল, বাতি নিয়া যখন রাত্রে ঘাটে যাই তখন পুকুরে পুঁটি মাছের খই ছোটে।

দেওরের চলছে কেমন?

হাতে যেদিন টাকা থাকে মচ্ছমুলা কইরা খায়। পরদিন হয়ত চুলায় হাঁড়ি চরে না। পরের দুয়ারে হাত পাতে। লোকেই বা কত দিব। একবার নিলে আর চিৎ হাত উপর করে না। রামার মা আমার থেকা দুইটা টাকা নিছিল, কিছুতেই দেয় না। সেদিন কয়েকটা চিমটি কাটা কথা বলায় এক টাকা বার করেছে। সিধা আঙুলে ঘী ওঠে না।

জাল কেমন?

জেমন দেবা তেমন দেবী। নিজের সংসারে মন নাই। পরের সবটাতে সে সকল ব্যসনের হলুদের গুঁড়া।

তার ছেলেটি দেখতে ভালো না।

ও কথা বইলো না দিদি, সোনার আংটি কি বাঁকা হয়।

তোমার মেয়ের নাম রাখছ কি?

ওর দাদু ওকে ডাকে অপূর্বা সুন্দরি।

এ যে কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন।

বড় মেয়ে আছে কেমন?

খাওয়া পরার কষ্ট নাই, কিন্তু হাড় ভাঙ্গা খাটুনি। কর্তা গেছিলেন মেয়ের বাড়ি। একজন পড়সী বললেন, আপনার বেয়ান ত নিবাইয়া কাপড়।

সে আবার কি?

জান ত ধোপা দুই রকম কাপড় কাচে, আটপৌরা ও নিবাইয়া। নিবাইয়া কাপড়ে মাড় থাকে আর তা সাফ বেশী। তা ভাজ করিয়া তুলিয়া রাখা হয়। কোথাও যাইবার সময় নিবাইয়া কাপড় পইরা যায়। বাড়িতে লোকজন আসলে আমার বেয়ান ফুল ফুলুরি রান্না করেন; হাসতামাসা ও গল্পগুজব করেন। প্রতিদিনের আটপৌরে গৃহস্থালি কাজের ধার দিয়াও তিনি যান না। তাই মেয়েটা সংসারের জন্য শরীরের রক্ত জল করছে। তিনি মেয়েকে পূজায় আনবেন বলছেন। মেয়ে ত দুই হাতে দিন ঠেলছে। মেয়ে ত আসব খরচের কথা ভাবছি। আমাদের আয় মধু-পর্কের বাটীর মত কাইৎ হলেই নাই।

ভাগ্‌নে কিছু সাহায্য করে না ?

তার কথা আর কইওনা। দুধ কলা দিয়া সাপ পুষছিলাম। পরের উপকার করা আর ছাইতে জল ডালা সমান।

তোমার ছোট শাশুড়ীকে আনমনা দেখি কেন ?

ভাইয়ের বাড়ি থেকা নিতে আসছিল। তিনি বললেন, ওঠ ছেমরি তর বিয়া—এই কথা বললেই কি আমি যাইতে পারি। আমি আছি কংসের কারাগারে এক পা বাইরে বাড়াবার উপায় নাই।

তার কয় ভাই পো ?

ভাইয়ের সন্তান নাই, বৌ বাঁঝা। পরের ছেলে পালে।

যশোদা বড় ভাগ্যমন্তী, পরের ছেলেতে পুত্রবতী।

সেদিন কথকতা শুনতে গেছিলাম। পাঠক না পারে গাইতে না পারে বলতে। যত ছিল নাড়া বইনা সবাই হইছে কীর্তনীয়া। তোমারা পয়সা দিবে একটি ; গান শুনতে চাও অক্রুর সংবাদ। তোমার বড়জা কেমন আছে ?

তার ছেলে ভালো চাকরি পাইছে। সে ত অহংকারে গদ গদ, মাটিতে পা পড়ে না।

জমের কৃষি নিয়া বড়াই করা ভাল না।

মানুষের জীবন কচুপাতার জলের মত—এই আছে, এই নাই। এত ত সেদিন দাস বাড়ির জলের জেতা ছেলেটা নিমিষের মধ্যে মইরা গেল। ব্যামো শ্যামো কিছু না, শুকনার কুমীরের ঘা। বিনা মেঘে বজ্রপাত। মা কাটা ছাগলের মত ছট্‌ফট্ করছে ; তার শোকে বৃক্ষের পত্র ছইড়া পড়ে ; পাষাণ গলে। বাপ কোড়ালের মত কোঁ কোঁ করছে। বুড়া ঠাকুরমা বলে, মৎসের মার আর পুত্রশোক কি। তোমার বড় ভাসুর কেমন ?

তার মুখে মিষ্টি পেটে বিষ। আপন স্বার্থ কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া নেন। কিন্তু ধরি মাছ না ছুই পানি। কোন কাজের মধ্যে তিনি নাই। ছোট ভাইয়ের বিবাদে পায়ে নল চালান। আনারসের পাতার মত মেজোজার দুই দিকেই ধার—যেমন কাজ কর্মে তেমন বিবাদে। ছোট দেওর ত এক জড়ভরত। যে যা করুক, তার কোন তাপ উত্তাপ নাই। মাঝের বাড়ির শাশুরি-বৌর মধ্যে অষ্টপ্রহর যুদ্ধ চলে। শাশুরি বলে— কলির বৌ-ত হাড়জ্বালানি

বললে হয় বাঁকা,

বুইড়া বুড়ি কুইড়ায় থাকব

আমরা নিমু বড় ঘর।

কলির বৌ ত ভাঙ্গল সোনার ঘর।

বৌ বলে—কানি, কত করবি কর

কভু না কাতর হবে চাঁদ সদাগর।

শাশুরি এমন দুতির দুত কাঠি মাইপা রাখে দুধ।

বৌ এমন দুতির দুত জল মিশাইয়া খায় দুধ।



ভয়ে সে বাড়ি যাই না। গেলে দোটানায় পড়তে হয়।

শ্যাম রাখি কি কুল রাখি অবস্থা দাঁড়ায়।

সেদিন শাশুড়ি হঠাৎ মারা গেছে। মইরা গেছে ধন্বন্তরি ওঝার পাইছে স্বতন্তরি !

বৌ বলে—আগে খাইমু পান্তার ভাত

পরে লেপুম ঘর

শাশুরি নাই ননদ নাই

কার বা করি ডর।

কিরে সজা, এখানে তুই কি আকড়া চাউলের দোকান করিস ? তর লেখা পড়া নাই ? হাতের লেখা যেন কাউয়ার পাড়া। সারাদিন শয়তানি। বাপ বাড়িতে আসলে সাপের মাথায় ধুলা পড়া পড়ে। সে ত ছেলেকে দায় আনে কুড়ালে কাঠে। তিনি বলেন যেমন হাউরা নল তেমন সুন্দইরা মুগইর চাই।

দায়রে বালি কুড়ালেরে শিল

বাঁদীরে লাথি গোলামের কিল

না দিলে তারা ঠিক থাকে না। শাসনে কি হবে। ইল্লত যায় ধুইলে খাসলত যায় মইলে।

হাড়িয়া কোণে কাউয়ায় ডিম পাড়ছে, তুফান আসবো, শিগ্‌গির বাড়ি যা !

এটা একটা লঙ্কাপোড়া। যেখানে যাই লগে লগে আসে। আমাগো পাশের বাড়ির দুই ভাই ভিন্ন হইয়াছে। একত্র করার জন্য সকলে বহু চেষ্টা করছে। কিন্তু ভাঙ্গা-শাঁখা কি জোড়া লাগে। লোকে বলে জল কাটালে দুই ভাগ হয় না। দক্ষিণের ঘরের স্বামী স্ত্রীর শরজাল চলছিল। বোন মধ্যে পড়িয়া মিট্‌মাট্ করিয়া দিয়াছে। এখন আর বোনকে জিজ্ঞাসা করে না। আমে দুধে মিশা গেছে, আঁটি আদাড়ে গেছে। দিনেশ নাকি বড় ঘরে বিয়া করছে তারা লোক কেমন ?

বৌ দেইখ্যা মনে হয় লোক ভালো। একটা ভাত টিপলে হাঁড়ির খবর পাওয়া যায়। তবে একটা কথা আছে জাহাজের সংগে ডিঙ্গি চলতে পারবে কি ? তেলেজলে মিশে কি ? এখন বাড়ি যাও নইলে বকুনি শুনতে হবে। সায়রে শয্যা শিশিরে আর কি ভয়। শাশুড়িরা কলির বৌর নিন্দায় পঞ্চমুখ। কিন্তু তারা যখন শরশয্যায় পড়েন তখন ত বৌদেরই টানতে হয়। বিয়ার পর এখানে একটা ইচার আংটিও পাই নাই। শাশুরি বলে, ছেলে রোজগার কইরা গয়না দিব। আশায় রইছেন কাউয়া পাকলে খাইবেন ডউয়া।

আমার ছোট দেওর খুব ভাল। কারো সঙ্গে তার অমিয়তা নাই। বেশী গলাগলিও নাই। পাড়ার সকলের সঙ্গে তার ভাই-আচারি ভাব। ননদ আর এক রকম, তার পেটে কথা পচে না। তিলরে তাল কইরা বলা তার অভ্যাস। শ্বশুরের চাঁছাছোলা কথা। কথায় রস-কস নাই। মেঝো কর্তার ছেলের কঠিন ব্যামো। তার মাথার উপর খাড়া ঝুলছে। তার কাছে পূজার মাথট চাইতে কারো সাহস হয় না।

ছেলেটার অসুখ বিসুখ কিছুই না। পাঠশালায় যাইবো না তাই ভেক ধরেছে।

কাল এমন কইরা নিমন্ত্রণ খাইছিল যে পেটের উপর লিক মারা যইত।

আচ্ছা সেদিন কাছারির লোকেরা গরিবের উপর অত্যাচার করিয়া গেল। মাতব্বরের জমিদারকে কিছু বলছে কি ?

মাতব্বরদের কথা ছাড়।
বড় বড় বানরের
বড় বড় পেট
লঙ্কায় যাইতে
মাথা করে হেঁট।

বিক্রমপুরের কোন কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে নারীরা সমবেত কণ্ঠে গান গাইতেন—

আমরা যত বঙ্গ নারী
পরবো না আর কাচের চুড়ি
সুরেনবাবু করেছেন মানা
সবার মনে আছে জানা।

কৌলিন্য প্রথার এক প্রধান কেন্দ্র ছিল বিক্রমপুর। ঘটক জাতির উদ্ভব ছিল বল্লালির অন্যতম উপজাত। কৌলিন্য প্রথার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ঘটকেরা বৃত্তিহীন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণশ্রেণীতে পরিণত হইয়া পড়ে। তারা বিনা নিমন্ত্রণে অকুলীনের বাড়ির বিবাহে উপস্থিত হতেন। অনাহূতদের অনাদর সহ্য করে তীর্থ কাকের মত আহারের প্রতীক্ষায় বসে থাকতেন। ধূলা-বালি মাখা ফরাশের উপর শুয়ে মশার কামড়ে জর্জরিত ঘটকেরা বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে দিতেন। দিনের বেলা তীর্থের ভিক্ষুকদের মত গৃহকর্তাকে ঘিরে ফেলে বার বার প্রত্যাখানের পর দুই চার আনা বিদায় সংগ্রহ করে কয়েক মাইল দূরে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যেতেন।

তাদের এই অদৃষ্টকে তারা হাস্যমুখে পরিহাস করতেন। বিক্রমপুরের পাঁচটি গ্রামের নাম পাশাপাশি বসিয়ে তারা তাদের এই বিড়ম্বনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় রেখে গেছেন।

রাইতভো বালিগাঁও পাইনা পয়সা কান্দনীসার। ( ভাষার এই নমুনা সংগ্রহে শ্রীমতী সুশীলা দেবী লেখককে বিশেষ সাহায্য করেছেন। )

# স্বখাত সলিল

## সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষ অনেক সময়ে অজ্ঞাতসারে নিজের অনিষ্ট নিজেই করে। গাছের একটি ডালে বসিয়া যদি ঐ ডালই কাটা হয়, তাহা হইলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরিবার জন্য অনুতাপ কবি শ্যামা মায়ের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। এইরূপ একটি আত্মঘাতী অপকর্ম পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক মাধ্যমিক পাঠ্যতালিকার আবশ্যিক বিষয়সমূহ হইতে সংস্কৃতকে বর্জনের প্রস্তাব। একজন সংস্কৃত সেবী ও সংস্কৃতশিক্ষক হিসাবে এই পরিকল্পনার কুফল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মন্তব্য এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। সবই বেদে আছে, ইহা বলিতে চাহি না। সংস্কৃত স্বর্গ, সংস্কৃত ধর্ম—ইহাও আমার প্রতিপাদ্য নহে। বর্তমানে সংস্কৃতের অবশ্য পাঠ্যতা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি মাত্র। চিন্তাশীল ব্যক্তি ও চিন্তানায়কগণের এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই উদ্দেশ্য, সংস্কৃতের স্মৃতিগান বা জীর্ণ পন্থাকে একমাত্র পন্থা বলিয়া প্রতিপাদন নহে।

সংস্কৃতের বিরুদ্ধবাদী বলিবেন, সেকেলে সংস্কৃতের একালে প্রয়োজন কি ? এই যুক্তিতে যদি সংস্কৃতকে বর্জন করিতে হয় তাহা হইলে নবীন পুত্র কন্যারও প্রবীণ পিতামাতাকে ত্যাগ করা উচিত বা তাঁহাদের পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতাকে অচল মুদ্রার ন্যায় প্রত্যাখ্যান করা সঙ্গত। সূর্য লক্ষ লক্ষ বৎসর রশ্মি বিকিরণ করিয়া থাকিলেও অদ্যাপি বলি—আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ ; অর্থাৎ, সূর্য প্রাচীন হইলেও উহার রোগনাশক শক্তি অটুট আছে। গঙ্গা সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া প্রবাহিত হইলেও তাহার শৈত্য পাবনত্ব হারায় নাই। চিকিৎসক প্রাচীন হইলে তাঁহার উপদেশ মূল্যবান্ বলিয়া বিবেচিত হয়। তেমনই মার্গসাহিত্য ( classical literature ) প্রাচীন হইলেও উহার শাশ্বত মূল্য আছে। আজও শিক্ষিত পরিবারে শিশুদের মনে পবিত্র ভাব এবং দয়া বীরত্বাদি উদ্বোধিত করিবার জন্য রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী দিয়া শিক্ষার সূত্রপাত হয়। ভক্তি, নীতিবোধ, প্রেম প্রভৃতি মানবিক ভাবের বীজ শৈশবে মনে উপ্ত না হইলে পরে আর হয় না ; এই সব ভাব না থাকিলে মানুষও ইতর প্রাণীর মধ্যে ভেদ রেখা ক্ষীণ হইয়া পড়ে। সংস্কৃত সাহিত্য এই সকল ভাবসম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বস্তুতঃ ইদানীন্তন কালে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যে সকল বিষয় পঠিত হয়, তন্মধ্যে মানবিক ভাবে উদ্বুদ্ধ করিবার ব্যাপারে বোধকরি কোন বিষয়ই সংস্কৃতের সমকক্ষ হইতে পারে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র মানুষকে অর্থোপার্জনকারী যন্ত্রে পরিণত করা নহে। এডুকেশন শব্দটির তাৎপর্য মানুষের মধ্যে যে উত্তম বৃত্তিগুলি আছে উহাদের পূর্ণ বিকাশ। শিক্ষার আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য, জীবন-দর্শন-গঠন। উপনিষদে এবং গীতায় ত্যাগের, কর্মের, মৈত্রীর যে আদর্শ আছে তাহা বিশ্বের মনীষীগণ কর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছে। এই অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশের পথ সংস্কৃত ভাষা ; অল্প বয়সে এই পথের সন্ধান দিতে না পারিলে অধিক বয়সে কি করিয়া উহাতে প্রবেশ সম্ভবপর হইতে পারে ?

প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, ইংরেজগণ তাঁহাদের মার্গ সাহিত্যকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয়

বিষয় বলিয়া মনে করেন। এমনকি, কাহারও কাহারও ধারণা যে, ঐ সাহিত্য পাঠ না করিলে gentleman বা ভদ্রলোক বলিয়া পরিগণিত হওয়া যায় না।

আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা গোষ্ঠীর উৎস সংস্কৃত ভাষা। ভবিষ্যজ্জীবনে কেহ যদি এইরূপ কোন ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করিতে বা উহাতে গবেষণা করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে সংস্কৃতের জ্ঞান ভিন্ন সে কি করিবে? প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, উৎকীর্ণ লিপিমালা প্রভৃতি বিষয়ে গভীর ব্যুৎপত্তি এবং গবেষণায়ও সংস্কৃত অপরিহার্য।

বিরুদ্ধবাদী বলিতে পারেন, সংস্কৃত পড়িয়া জীবিকার্জন হয় না। ইহা সর্বাংশে সত্য নহে। সংস্কৃত জ্যোতির্বিদ্যা আয়ুর্বেদ প্রভৃতি বিষয় অধ্যয়ন করিয়া হাজার হাজার লোক কি জীবিকা অর্জন করিতেছেন না? শুধু জীবিকা নহে, এই সকল বিদ্যার সাহায্যে বহু লোক সমৃদ্ধশালীও হইয়াছেন।

যদি বলেন, সংস্কৃত সাহিত্য পড়িয়া মানুষ ইহবিমুখ হইয়া পড়ে। না, তাহাও সত্য নহে। কৃষিবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, রসায়ন, গণিত, জ্যামিতি প্রভৃতি বহু বাস্তব জীবনের উপযোগী বিষয় সংস্কৃতগ্রন্থ সমূহে লিপিবদ্ধ আছে।

কেহ বলিতে পারেন, সংস্কৃত অত্যন্ত কঠিন ভাষা। সুকুমারমতি বালক-বালিকার উপরে ইহা চাপাইয়া দেওয়া সঙ্গত নহে। উত্তরে বলিতে পারি, তাহা হইলে ছেলেমেয়েকে নাবিকেল খাইতে দিবেন না; ইহার বহিরাবরণ অতি কঠিন এবং ইহার ছেদন কষ্টসাধ্য। কর্কশ বহিরাবরণের ভিতরে কোমল পদার্থের আস্বাদনই কাম্য। সংস্কৃতের শিক্ষা পদ্ধতির কিঞ্চিৎ সংস্কার করিলেই ইহার আপাত কর্কশ রূপটি তিরোহিত হইবে।

এইবার ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে আসা যাউক। জাতীয় দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে সংস্কৃত প্রতিটি নাগরিকের অবশ্য পাঠ্য। ভাষা, বেশভূষা, রীতিনীতি, আহার বিহারে যে দেশে এত বিভিন্নতা। সেখানে সংহতিস্থাপন না করিতে পারিলে ভারতের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। জাতীয় সংহতির অভাবেই অতীতে ভারত বৈদেশিক আক্রমণের লক্ষ্য হইয়াছিল এবং বিজাতীয় শাসনের কবলিত হইয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্য ও ভাষা সমগ্র ভারতের সম্পদ। এই চেতনা উদ্বুদ্ধ হইলে প্রাদেশিকতা, ভাষাজনিত হিংসা, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি অনিষ্টকর মনোভাব কিয়ৎ পরিমাণে দূরীভূত হইবে। কিন্তু, সংস্কৃতের প্রতি অনুরাগ, শ্রদ্ধাও ইহাতে ব্যুৎপত্তি ব্যতীত এই চেতনা কি করিয়া জাগ্রত হইবে?

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের কথা একবার ভাবিয়া দেখুন। বিশ্বের দরবারে, বিশ্ব সংস্কৃতির মহা সম্মিলনে ভারত কি স্বীয় পরিচয় দিবে? তাহার বেদ, উপনিষদ্, রামায়ণ, গীতা, দর্শন প্রভৃতিই ত তাহার গৌরব খ্যাপন করিবে। আজিকার জগতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার যে অগ্রগতি প্রতীচ্যে হইয়াছে তাহার তুলনায় এই সকল বিষয়ে ভারতের দান নগণ্য। কিন্তু, ভারতের প্রজ্ঞা যুগ যুগ ব্যাপিয়া তাহাকে বিশ্বসভায় শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকার দান করিয়াছে। প্রতীচীর বহু দার্শনিক ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ পিথাগোরাস্ ( Pythagoras ) এর উপরে সাংখ্যদর্শনের প্রভাবের উল্লেখ করা যায়। শোপেনহাওয়ারের ( Schopenhauer ) উপরে বেদান্তের প্রভাব স্পষ্ট। এক 'পঞ্চতন্ত্র' গ্রন্থখানি প্রায় পঞ্চাশটি বিদেশী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে এবং বিশ্বের নীতিমূলক গল্পসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। অতি আধুনিককালে কতক ইংরাজ ও মার্কিন কবির রচনায়



গীতা উপনিষদের প্রভাব প্রকট হইয়াছে। ঔপন্যাসিক সমারসেট মম্ ( Somerset Maugham ) এর Razor's Edge ( ক্ষুরস্য ধারা ) নামক গ্রন্থখানির নামই উপনিষদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার নিদর্শন।

পারস্যদেশে আরবে সংস্কৃত আয়ুর্বেদ ও 'পঞ্চতন্ত্রে'র প্রভাব বিদ্যমান। প্রাচীনকালে এই দেশের সম্রাট্ দরায়ুস্ ( Darius ) 'মনুসংহিতা'র আদর্শে কিছু কিছু আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের ব্যাপক প্রভাব সুদূর প্রাচ্যের ( Far Fast ) কতক দেশেও প্রমাণিত হইয়াছে। যব দ্বীপ, বলি, শ্যাম, কম্বুজ প্রভৃতি দেশে উৎকীর্ণ লিপিমালা, আচার ব্যবহার, সাহিত্য প্রভৃতিতে রামায়ণ মহাভারত ও বিবিধ সংস্কৃত কাব্যাদির প্রভাব সম্বন্ধে গবেষণা গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

স্বাধীন ভারত অন্যান্য দেশের সঙ্গে, বিশেষতঃ তাহার এশিয়াবাসী প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে, মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছুক। সংস্কৃতের মাধ্যমে ঐ সকল দেশের সহিত ভারতীয় সংস্কৃতির যোগসূত্রটি আবিষ্কার করিতে পারিলে এই মৈত্রী দৃঢ়তর হইবে, সন্দেহ নাই।

ভারতবাসীকে সর্বপ্রথমে ভারতীয় হইতে হইবে, ভারতের অন্তরাত্মাকে বুঝিতে হইবে এবং দেশে বিদেশে অহিংসার, আধ্যাত্মিকতার, শান্তির বাণী শুনাইতে হইবে। সংস্কৃত ব্যতীত এই কার্য অসম্ভব। ম্যাক্‌স্‌মূলার বলিয়াছিলেন, হিমালয়ের উচ্চতা যেমন এভারেষ্টের উচ্চতা দ্বারা নির্ধারিত হবে, অন্যান্য শিখরের দ্বারা নহে, তেমনই ভারতাত্মার মহনীয়তা উপলব্ধি করিতে হইলে বেদপাঠ করিতে হইবে। বুদ্ধ, বিবেকানন্দ, গান্ধী, চৈতন্য, রামমোহন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি ধর্মপ্রবর্তক, সমাজ-সংস্কারক, রাজনীতিবিদ্, সাহিত্যিক সকলেই সংস্কৃত সাহিত্যের অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে ভাবসমূদয় আহরণ করিয়াছিলেন। আজ দেশ বিদেশে যে যোগের মহিমাকীর্তন হইতেছে, যে যোগ বিবিধ রোগনাশক বলিয়া খ্যাপন করা হইতেছে, যাহাকে শান্তির অন্যতম সোপান বলিয়া মনে করা হইতেছে তাহার মূলও সংস্কৃত রচিত গ্রন্থ।

বিরুদ্ধবাদী বলিতে পারেন যে, সংস্কৃতকে বর্জন না করিয়া ঐচ্ছিক বিষয় সমূহের অন্তর্ভুক্ত রাখিলে ক্ষতি কি? যাহার ইচ্ছা সে উহা শিখিবে। কিন্তু, কোমলমতি অনভিজ্ঞ ছাত্রছাত্রীগণ সংস্কৃতের কঠিন বহিরাবরণ দেখিয়াই উহা বর্জন করিবে। ইহা পাঠে ভবিষ্যতে কি উপকার হইবে তাহা উহাদিগকে বুঝাইবার লোক কম, নিজেরাও বুঝিতে পারিবে না। শিশু অনেক সময় উপকারী খাদ্য অনেক সময়ে আহার করিতে অনিচ্ছুক হইলে মা উহা ভক্ষণ করিতে বাধ্য করেন। তাহাতে ফল ভালই হয়। সুতরাং সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য করিলে বিদ্যার্থিগণ আপাততঃ ক্ষুব্ধ হইতে পারে; কিন্তু, পরিণাম মঙ্গলজনকই হইবে।

বর্তমান যুগে সংস্কৃতের উপযোগিতা সম্বন্ধে প্রখ্যাত ভারতবিজ্ঞানী ব্যাসামের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব—the sages who meditated in the jungles of the Ganges Valley six hundred years or more before Christ are still forces in the world.

[ যে ঋষিগণ গাঙ্গেয় উপত্যকায় বনে খ্রীষ্টজন্মের ছয় শত বা তদধিক বৎসর পূর্বে ধ্যান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের উপদেশ অদ্যাপি পৃথিবীতে প্রেরণা জোগাইতেছে। ]

# প্রাচীন ভারতে নৌ বাণিজ্য

উমাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

খৃষ্ট জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে আর্যেরা যখন ভারতের উত্তরাঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেন তখন তাঁরা যে বিদ্যায় কতটা পারদর্শী ছিলেন তার কোন বিবরণ বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায় না। তবে বুদ্ধের মৃত্যু কালে ( অর্থাৎ ৪৮৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দে ) ভারতের নাবিকেরা যে জলপথে ব্রহ্মদেশ, আধুনিক ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়ায় গিয়ে পৌঁছেছিলেন তার কিছু কিছু প্রমাণ সম্প্রতি পাওয়া গেছে; খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে স্থলপথে যেমন আফগানিস্থান, মধ্য-এশিয়া, তিব্বত প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল তেমন এদেশের বণিকেরা জলপথেও আফ্রিকা ও ইউরোপের নানা বন্দরে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে সেকালে যে ভারতীয় সওদাগরদের লেনদেন চলতো তার অনেক ঐতিহাসিক প্রমাণও আমরা পেয়েছি; ভিসুভিয়াসের অগ্নুৎপাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হারকুইলেনিয়াম নগরীর ধ্বংসস্তূপ থেকে কিছুদিন আগেও ভারতীয় শিল্পীর তৈরী একাধিক শিল্পকীর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। সেকালে রোমের অভিজাত সমাজে ভারতীয় আতর, মশলা, কার্পাস বস্ত্র, লাক্ষা, চুনী-পান্না-হীরে, চিনি, চাল, ঘি, হাতীর দাঁতের নানা শিল্প দ্রব্য, নীল, হাতী, বাঘ, সিংহ, গণ্ডার, বাঁদর, টিয়া, ময়ূর, প্রভৃতি পশুপাখির বিশেষ চাহিদা ছিল; রোমের সঙ্গে নৌ বাণিজ্যে প্রতি বছর ভারতের যে অনুকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত থাকতো তার উল্লেখ পাই প্লিনির রচনায়; প্রতি বছর তাই রোম থেকে প্রচুর পরিমাণ সোনা ও রৌপ্য মুদ্রা চলে আসতো, ভারতের বন্দরে। একসময় দক্ষিণ ভারতে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও যে রোমের মুদ্রা ব্যবহৃত হত তার কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে পণ্ডিচেরীর কাছে আরিকামেডুতে; ঐ এলাকায় খনন কার্য চালিয়ে স্যার মর্টিমোর হুইলার একটি প্রাচীন বাণিজ্য কেন্দ্র ও বন্দরের সন্ধান পেয়েছেন; শুধু তাই নয়, আরিকামেডুতে প্রচুর রোমক মুদ্রাও পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিক প্লিনির ধারণা প্রচুর রোমক মুদ্রা ভারতের বাজারে চলে আসার ফলেই রোমের ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দাভাব দেখা দেয়; এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ই শেষ পর্যন্ত রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটায়; প্লিনি তাই উচ্চমূল্যে ভারতের বিলাসদ্রব্য কেনার জন্যে সেকালের অভিজাত সমাজকে দোষারোপ করেছেন; তাঁর ধারণা, রোমক রমণীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে প্রতিবছর ভারতীয় বণিকেরা রোমে প্রায় এক কোটি টাকা ( সেস্টারসেস্ ) মূল্যের জিনিষ বিক্রয় করে অফুরন্ত পরিমাণ সোনা ভারতে নিয়ে চলে যেতেন। অবশ্য প্লিনির এই বিশ্বাস কতটা সত্য সে সম্পর্কে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। যাইহোক রোম সাম্রাজ্যের ধীরে ধীরে পতন ঘটলে পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে সাময়িকভাবে ভারতের নৌ বাণিজ্যও অনেকটা কমে আসে। তখন আরব ও পারস্যের বণিকেরা ভারতের বন্দর থেকে পণ্য সামগ্রী তুলে নিয়ে পৌঁছে দিতে থাকে ইউরোপের বন্দরে; সেকালে আলেকজান্দ্রিয়া, জেনোয়া, ভেনিস প্রভৃতি বন্দরেই ভারতের মাল খালাস করা হত। মার্কো পোলের ভ্রমণ বৃত্তান্তেও এই কথার স্বীকৃতি আছে।

মধ্যযুগের ইউরোপে ক্রমশঃ জীবন যাত্রার মান উন্নত হতে থাকলে সে দেশের বাজারে ভারতীয়



বিলাস দ্রব্যের চাহিদাও বাড়তে থাকে; সেই সঙ্গে ভারতের লোহা, চিনি, মস্‌লিন প্রভৃতি বস্তুও তাঁরা আমদানী করতে থাকেন; পাশ্চাত্য জগত থেকে আমরা আনতে থাকি সোনা, কাঁচের বাসন, মদ, প্রবাল, টিন, তামা প্রভৃতি; আরিকামাডুতে ইউরোপের কারখানায় তৈরী বেশ কিছু চীনামাটি ও কাঁচের পাত্র পাওয়া গেছে; তুরস্ক সাম্রাজ্যের ক্রমবিস্তারে বাইজানটাইন সভ্যতার পতন হলে সাময়িক ভাবে ইতালীয়দের সঙ্গে আমাদের জলপথে যোগাযোগ ব্যাহত হয়। ঠিক এই সময়েই ক্রিষ্টোফার কলম্বাস অ্যাটল্যান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ভারতে পৌঁছাবার নতুন রাস্তা বার করবার চেষ্টা করেন। এই খোঁজাখুঁজির ফলেই আমেরিকা আবিষ্কার হয়। ভাস্কো-ডা-গামা আফ্রিকা ঘুরে ঠিক ঐ উদ্দেশ্যেই ভারতের বন্দরে এসে হাজির হন। কারণ ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের প্রতিযোগিতায় তখন মেতে উঠেছে ইউরোপের দেশগুলি। কিন্তু শুধু ইউরোপ বা আরব দেশগুলির সঙ্গেই নয় গুপ্ত যুগের আগেই ( অর্থাৎ খৃষ্টীয় তৃতীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ) দক্ষিণ পূর্ব ভারতের সওদাগরেরা চীনের সঙ্গেও জলপথে সংযোগ স্থাপন করেন; শুধু তাই নয়, পশ্চিমের দেশগুলির সঙ্গে সরাসরি নৌ বাণিজ্য যতই ব্যাহত হতে থাকে ততই আমাদের বণিকেরা চীন ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন; চীনের রাজদরবারে ভারতের গন্ধদ্রব্য, মশলা, মস্‌লিন, হীরে জহরত প্রভৃতির যে যথেষ্ট চাহিদা ছিল তা ফাহিয়েন ও হুয়েন সাঙের বিবরণ থেকেও জানা যায়। চীন থেকে আমরা আমদানী করতাম রেশম, চীনামাটির বাসন, ব্রোঞ্জের তৈরী তৈজসপত্র, আরও নানা টুকিটাকি জিনিস।

কোন কোন উৎসাহী গবেষক ভারতীয় নাবিকদের সঙ্গে উত্তর ইউরোপের জলচারী ভাইকিংদের তুলনা করেছেন। এই ভাইকিংরা ছিল দুঃসাহসিক অভিযাত্রী; তারাই প্রথম জলপথে পৃথিবী পরিভ্রমণ করে আমেরিকায় গিয়ে পৌঁছায়। তবে নৌ বাণিজ্যে এদের কোন আগ্রহ ছিল না, তাই নৌ চালনায় দক্ষ ভারতীয় বণিকদের সঙ্গে এদের তুলনা করা সমীচীন নয়। এছাড়া জাহাজ নির্মাণের ব্যাপারে ভারতীয় যন্ত্রকুশলীরা এই ভাইকিংদের মত দক্ষ ছিল কিনা সেটাও বিতর্কের বিষয়। সুপণ্ডিত ব্যাশমের মতে, যে সব বাণিজ্যতরীতে সেকালে ভারতীয় পণ্য বিদেশে রপ্তানী করা হত তার অধিকাংশই ছিল বিদেশী। তিনি আরও বলেন প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে যদিও এক হাজার যাত্রীবহনক্ষম বাণিজ্য পোতের বর্ণনা আছে, তবু এই বিবরণ কতটা বাস্তব তথ্য ভিত্তিক সে সম্পর্কে সন্দেহ থেকে যায়। ঐতিহাসিক প্লিনির রচনায় দেখি যে রোমের বন্দরে তখন যে সব বড়ো বড়ো ভারতীয় জাহাজ এসে লাগতো সেগুলি ছিল তিন হাজার তৈলপাত্র ( তাঁর ভাষায় আমফেরা ) বহনের উপযোগী। অর্থাৎ একালের হিসাব মত প্রায় ৭৫ টন। পঞ্চম শতাব্দীতে ফা-হিয়েন যে ভারতীয় জাহাজে চেপে সিংহল থেকে জাভা গিয়েছিলেন তাতে সর্বমোট যাত্রী ছিল দু'শ জন। তাঁর মতে, ভারতের বাণিজ্য তরণীর এটাই নাকি সবচেয়ে বেশি যাত্রীবহনের ক্ষমতা। অজন্তার গুহায় পঞ্চম ষষ্ঠ শতাব্দীর ভারতীয় বাণিজ্য পোতের যে সব ছবি আছে তার থেকেও ঐ জাহাজের দৈর্ঘ্য বা আকার ঠিক কেমন ছিল তা' অনুমান করা কঠিন; যেমন, দু'নম্বর গুহায় তিন মাস্তুল বিশিষ্ট যে জাহাজের ছবি দেখি তাতে মাত্র একজন নাবিককে বসে থাকতে দেখা যায়। জাভার বোরবুদুর মন্দিরেও ভারতীয় তরণীর অপূর্ব চিত্র খোদিত আছে; তার থেকেও জাহাজের সঠিক আকার অনুমান

করা কঠিন। কারণ ঐ ফ্রিজের ( ভাস্কর্যের ) সব চেয়ে বড়ো জাহাজটির যাত্রী মাত্র পনেরো জন। শুধু তাই নয়, এই তরী-যুথ অনেকটা একালের পাল তোলা জেলে ডিঙির মত দেখতে। তাছাড়া তা'তে হাঁড় দেখা গেলেও কোন হাল নেই।

একটা বিষয়ে একালে প্রায় সকলেই একমত যে প্রাচীন ভারতে জাহাজ নির্মাণ কালে লোহার পাতি বা পেরেক ব্যবহার হত না; নারকেলের দড়ি দিয়েই বরং বাঁধা হত কাঠের পাটাতনগুলি। অনেকের অনুমান, জলের নীচে থাকা কাল্পনিক চুম্বক পাহাড়ের ভয়েই বর্জন করা হত লোহার পেরেক বা পাতি। দক্ষিণ আমেরিকার আদি বাসিন্দারাও অনুরূপ ভাবে বালসা কাঠের বড়ো বড়ো ভেলা ও জাহাজ বানাতেন। নোনা জলে কাঁচা লোহার পেরেকের থেকে নারকেলের দড়ি যে ঢের টেকসই এটা তারাও বুঝেছিলেন। 'কনটিকি' বইটিতে থর হেয়ারডাল এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

সেকালে ভারতের বণিকেরা কিভাবে দেশ বিদেশে পাড়ি দিতেন তার অনেক কাহিনী সমকালীন ভারতীয় সাহিত্যে ছড়িয়ে আছে। যেমন, একটি জাতকের গল্পে দেখা যায় যে সেকালের ভৃগুকচ্ছ বন্দর থেকে একটি ভারতীয় বাণিজ্যপোত 'বভেরু'তে পণ্য সম্ভার নিয়ে গিয়েছিল; ভারত তত্ত্ববিদ ব্যাশমের অনুমান যে এই বভেরু বন্দর আসলে প্রাচীন ব্যবিলন। সিংহলী কাব্য 'রাজাবলীয়'তেও ভারতের বণিকদের বাণিজ্য অভিযান সম্পর্কে সত্য ও কল্পনা মিশ্রিত অনেক কাহিনী পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে লেখা 'মিলিন্দ পঞ্‌হো' নামক পালি গ্রন্থে জনৈক ভারতীয় বণিক যে বাণিজ্য সূত্রে চীন, জাভা, সুমাত্রা, ব্রহ্মদেশ এবং আলেকজান্দ্রিয়ার গিয়েছিলেন তাঁর স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে; খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে লেখা দণ্ডীর 'দশকুমার চরিত' বইটিতেও এক সওদাগরের পুত্র যে কৃষ্ণ যবনদের দ্বীপে বাণিজ্য করতে গিয়েছিল তার বিবরণ দেখি; অনেকের ধারণা, এই 'কৃষ্ণ যবনদের দ্বীপ' আসলে হয় আধুনিক জানজিবার নয় ম্যালাগাসি রাজ্য। এছাড়া, আমাদের মঙ্গলকাব্যে ধনপতি সওদাগর কিভাবে সিংহলে বাণিজ্য করতে গিয়েছিলেন তার বিবরণ তো আমরা অনেকেই পড়েছি।

পরিশেষে, প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যকেন্দ্র ও বাণিজ্য পথ সম্পর্কে দু'এক কথা বলা প্রয়োজন। সেকালে ভারতের প্রধান বন্দর ছিল ত্রিগুচ্ছক বা ভৃগুচ্ছক, সুপারা, পাটল, চম্পা, তাম্রলিপ্তী, মুশিরি, কোরকাই আর কাবেরী পত্তনম্। এর মধ্যে প্রথম তিনটি বন্দর অবস্থিত ছিল ভারতের পশ্চিম উপকূলে; চম্পা আর তাম্রলিপ্তী ছিল পূর্ব ভারতের দুই প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র; আর শেষোক্ত তিনটি বন্দর থেকে দক্ষিণ ভারতের নৌ বাণিজ্য পরিচালিত হত। ভৃগুকচ্ছ বন্দরটি অবস্থিত ছিল নর্মদার মোহনায়, সুপারা ছিল বোম্বাই-এর কাছে আর পাটল সিন্ধুনদের অববাহিকায়। এই তিনটি বন্দর থেকে সুদূর রোম, সিংহল, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিতেন ভারতের সওদাগরেরা। ভারতের পূর্বপ্রান্তে গঙ্গানদীর মোহনায় ছিল চম্পা নামে বন্দরটি; সেখান থেকে পণ্য সম্ভার গিয়ে পৌঁছাতো সুমাত্রা, জাভা ও ব্রহ্মদেশে। মৌর্য যুগে (অর্থাৎ তৃতীয় খৃষ্ট পূর্বাব্দে) আর্য সভ্যতা ক্রমশঃ ভারতের পূর্বপ্রান্তে বিস্তার লাভ করলে গঙ্গার অববাহিকায় তাম্রলিপ্তী ( আধুনিক তমলুক ) নামে আর একটি বন্দর গড়ে ওঠে; এই বন্দরের সমৃদ্ধির ফলে চম্পার গুরুত্ব অনেকটা হ্রাস পায়। এই তাম্রলিপ্তী থেকেই আচার্য বোধিধর্ম চীন যাত্রা করেছিলেন; এই তাম্রলিপ্তীর উল্লেখ পাওয়া যায়



হুয়েন সাঙের রচনাতেও। সারা পূর্ব ভারতের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল এই বন্দরটি। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে রোম শাসিত মিশরের নাবিকেরা যে ভারতের এই সমস্ত বন্দর সম্পর্কে যথেষ্ট খোঁজ খবর রাখতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় সমসাময়িক কালে রচিত একটি গ্রীক গ্রন্থে; বইটির নাম—'দি পেরিপ্লাস অব দি এরিথ্রিয়ান সী' ( The Periplus of the Erythrean Sea )। এই পেরিপ্লাসে, টলেমির লেখা 'ভূগোলে' আর প্রাচীন তামিল কবির লেখা 'এত্তুতোগাই' কাব্যে দক্ষিণ ভারতের নৌ-বাণিজ্যেরও কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া গেছে। দাক্ষিণাত্যের প্রধান বন্দর ছিল 'মুশিরি' বা 'মুশ' ( পেরিপ্লাসে একে বলা হয়েছে Musiris ); এই 'মুশিরি' অবস্থিত ছিল চের রাজ্যে ( একালের কেরালায় )। এছাড়া কোরকাই ( একালের তুতিকোরিণ ) ও কাবেরী পত্তনম্ বন্দর অবস্থিত ছিল যথাক্রমে পাণ্ড্য ও চোল রাজ্যে। চোল নরপতিরা যে বন্দরের সংস্কার ও উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখতেন তার কিছু ঐতিহাসিক প্রমাণও পাওয়া যায়; রাজা করি ফালন কাবেরী নদীর মোহনায় সিংহলী যুদ্ধ বন্দীদের দিয়ে কাবেরী পত্তনম্ বন্দরটি তৈরী করিয়েছিলেন; এই কৃত্রিম বন্দরের প্রবেশ মুখে ছিল একটি স্থউচ্চ বাতি স্তম্ভ। কাবেরী পত্তনম্ এর জেটিতে যবনদের বড়ো বড়ো জাহাজ থেকেও মাল খালাস করা হত। বন্দর কর্মীরা বিদেশ থেকে আমদানী করা পণ্যের শুল্ক নির্দ্ধারণ করে' তার ওপর রাজকীয় সীলমোহর লাগিয়ে দিতেন; তারপর সেই সব দ্রব্য জমা করা হত শুল্কাধীন পণ্যাগারে। এখন এই কাবেরী পত্তনম্ একটি গণ্ডগ্রাম; সেখানে বেশ কয়েক ঘর জেলের বাস, তবু প্রাচীন ঐতিহ্যের বেশ কিছু নিদর্শন আসেপাশে ছড়িয়ে আছে। এরপর অতীতের নাবিকেরা কোন কোন জলপথ ব্যবহার করতেন তা বলি। অতীতে আমাদের অধিকাংশ বাণিজ্যপোত যাতায়াত করতো ভারতের উপকূল ধরে। তবে আফ্রিকায় পাড়ি দেবার কালে ভারত মহাসাগরের অনুকূল সমুদ্র-স্রোতের সন্ধান করতে হত ভারতীয় নাবিকদের; বিভিন্ন সমুদ্র স্রোতের গতিপথ সম্পর্কে প্রাচীন ভাইকিংদের মতই তাঁরা ছিলেন সচেতন; আর দিক নির্ণয়ের জন্যে বিভিন্ন নক্ষত্রের অবস্থান বিচার করে দেখতেন ভারতীয় সওদাগরেরা। আলেকজান্দ্রিয়ায় যাবার সময় লোহিত সাগরে অনুকূল বাণিজ্য বায়ুর সুযোগ নিত ভারতীয় বাণিজ্য তরীগুলি। ৪৫ খৃষ্ট পূর্বাব্দে হিপ্‌পলাস মৌসুমী বায়ুর গতিপথ আবিষ্কার করলে ভারতীয় বণিকদের নৌ যাত্রা আরও সহজ ও ব্যাপক হয়ে ওঠে।

# রাজা ও তপতী নাটকে সঙ্গীত যোজনার নাটকীয় তাৎপর্য

বিমলভূষণ চট্টোপাধ্যায়

কথা যেখানে শেষ গানের শুরু সেখান থেকে। অন্তরের আবেগোচ্ছ্বাসকে প্রকাশ করতে কথা যেখানে পঙ্গু হয়ে পড়ে, উপলব্ধির নিবিড়তার ভার যখন কথার পক্ষে বহন করা আর কোনোমতেই সম্ভব হয় না তখনই তা রূপ পায় সুরে। ভারতীয় ঋষি বলেছেন ;—'শব্দ ব্রহ্ম'—সৃষ্টির আদিমতম রহস্য সঙ্গীতে বিধৃত। কথা, ছন্দ, বাস্তবতার আলেখ্য কোন কিছুকে আশ্রয় না করে সুরের বিচিত্র বিস্তার আত্মার গভীরে যে অব্যক্ত আনন্দের শিহরণ তোলে তা বিশ্বচিত্ততার নিঃসীম অবকাশের ব্যাপ্তিতে অনধিগম্য। তাই বলা হয়েছে—'Every form of art aspires to the condition of music. নাটকে শিল্প-মূল্যের দিক থেকে সঙ্গীত যোজনা করা হয় এবং তার প্রয়োজন বহুমুখীন। প্রথমতঃ সংলাপ যেখানে নাটকীয় চরিত্র এবং সংঘাত পরিস্ফুটনে পঙ্গু হয়ে পড়ে নাট্যকার সঙ্গীত যোজনা করেন নাটকের ভাবরূপকে গভীর এবং গতিসঞ্চারী করবার জন্য। দ্বিতীয়তঃ নাটকের একঘেয়েমীর মধ্যে, রুদ্ধশ্বাস তীব্র গতির মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য এবং আত্মস্থ হওয়ার অবকাশ সৃষ্টির জন্য সঙ্গীত যোজনা করেন। এইটে হল অলঙ্করণের দিক। কিন্তু অলঙ্করণ কখনও অলঙ্কৃতকে ছাপিয়ে যাবে না। নাট্যবস্তুর অপরিহার্য অঙ্গরূপেই অলঙ্করণ স্থান পাবে। তৃতীয়তঃ নাটকে বাস্তবতার স্পর্শ আনবার জন্যেও প্রয়োজন হয় সঙ্গীতের। বাস্তব মানুষ অনেক সময় স্বীয় চিন্তা, কর্ম ও পরিবেশকে লক্ষ্য করে অজ্ঞাতেই গান গেয়ে ওঠে। নাটকে সেই পরিবেশের অনুরূপ চিন্তা ও কর্মে বাস্তবতার স্পর্শ আনবার জন্য প্রয়োজন হয় সঙ্গীত সংযোজনার।

মোটামুটি ভাবে উপযুক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্র নাটকের সঙ্গীত সংযোজনা বুঝে নিতে হবে। কারণ রবীন্দ্র নাটকের গানগুলোর একক ভাবে মূল্য যেমন অসামান্য, তেমনই নাটকীয় বিরোধের আবর্তে, ভাবানুভূতির দ্বন্দ্ব মুহূর্তে তরঙ্গশীর্ষ কিরীটের জ্যোতিমালার সুষম সঙ্গতিতে তাদের বৃহত্তর দ্যোতনা আছে। নাটকের উপজীব্য ভাববস্তু অনুযায়ী আবেগোচ্ছ্বাস কখনও বীর্যবত্তায়, কখনও বা প্রেমের স্নিগ্ধতায়, কখনও বা মুক্তির এষণায়, কখনও বা মুক্তির লীলারস আস্বাদনের তন্ময়তায়, কখনও বা অতীন্দ্রিয় চেতনায় তথা আত্মিক উপলব্ধির অবকাশের কমনীয়তায় শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠেছে তাদের সূক্ষ্মতম এবং নিবিড়তম মুহূর্তগুলো নাটকের সঙ্গীতাংশে বিধৃত হয়েছে। সঙ্গীতগুলো নাটকের ভাববস্তুর সঙ্গে চরিত্রের প্যাটার্ণের সঙ্গে গভীর ভাবে অন্বিত। এই হল রবীন্দ্র-নাটকে সংযোজিত সঙ্গীত সম্পর্কে সাধারণ সত্য। আমরা এইবার 'রাজা' ও 'তপতী' নাটকের সঙ্গীত সংযোজনার নাটকীয় তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে উক্ত বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করব।

রাজা—আমরা বলে এসেছি যে, কথায় যখন আশ মেটে না, সুরের বাচনিক ওঠানামা বা স্বরগ্রামের চড়াই উৎরাই স্থান বিশেষে, শব্দ বিশেষে জোর দিয়ে কথা বলে ওঠে, নাটকের অন্যান্য আঙ্গিক, আক্ষেপ-বিক্ষেপ, হাসি-অশ্রুবর্ষণ ইত্যাদি দিয়ে ভাবের গভীরতা, প্রাণের কথাটি আর বলা হয়ে ওঠে না, তখন আশ্রয় নিই গানে। যুদ্ধের রক্তোন্মাদনার জন্য যেমন সঙ্গীত রচিত হয়েছে সবাকে



রক্তস্নানে উৎসাহিত করার জন্য, হননেচ্ছাকে তীব্রতর করবার জন্য, তেমনই আবার গভীরতম আত্মিক উপলব্ধির নিবিড়তাকে আস্বাদন করবার জন্য মুক্তির অবকাশ রচিত হয়েছে গানে।

রাজা নাটকটি এমনই একটি সঙ্গীতময় কাব্যসুষমামণ্ডিত দার্শনিকতার রূপকারকতা। প্রথম দৃষ্টিতেই দেখি গানের পথ বেয়ে রাজা আসছেন আর রূপাতীত দেয়ালীর আলো জ্বলছে যাদের বুকে, সেই বাস্তব জগতের ঘন অমারাত্রিকে অতিক্রম করে যিনি কোটি কোটি তারার আলোর মালা গাঁথেন আকাশে তার কাঁপন লেগেছে যাদের হৃদয়ে তারাই গেয়ে উঠেছে গান। গাইছে সুরঙ্গমা, ঠাকুর্দাদা, শম্ভু, সুধন, বাউল, ক্ষ্যাপা আর যাদের বুকে লেগেছে সুরের ছোঁয়া। রাণী রূপ খুঁজলেন, চোখের দেখাতে হৃদয়ের মাধুর্য, গভীরতা যাচাই করতে গিয়ে বয়ে আনলেন শাস্তি, আর অপর হৃদয়ের যদি কোনও পরিচয় পেয়ে থাকেন তবে তা হল কুণ্ঠিতা। রাণী চেয়েছিলেন এমন রাজার রাজত্বে না মিশে, রাজাতে যে বিচিত্র আনন্দস্রোত তাতে নিজেকে অভিষিক্ত না করে, নিজের একাকিত্বের দম্ভে, রূপের অভিমানে রাজাকে একার করে পেতে—স্থূল ইন্দ্রিয়সুখকর ক্ষেত্রে রাজাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে। এই তামসিকতা যেদিন চোখের জলে ধুয়েমুছে গেল সেদিন রাণী সুদর্শনার কণ্ঠে মূর্ছিত হল সঙ্গীত ;—'অতল অন্ধকারে' ডুবিয়ে দেওয়ার আকুতি ধ্বনিত হল গানে।

এই নাটকে গান গাইছে না কারা? গাইছে না হিসেব-নিকেশ করবার দলে যারা,—যারা স্থূল ইন্দ্রিয়াসক্ত বস্তুনিষ্পৃক্ত। এই রাজ্যে যারা বিদেশী, যারা সাধারণ গান গাইছে না তারা। ভাবের বন্যায় অন্তরাত্মা হি হি করে না কাঁপলে সে আবার রাজার মুন্সি না কি? তার গলায় গান আসবে কোথা থেকে? আর গান গাইছে না রাজন্যবর্গ, যারা দখল, ক্ষমতাবিস্তার, স্থূল ভোগবিলাসের জন্য অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা শুনিয়ে এসেছেন চিরকাল, অন্ধ দম্ভের উপরে তাদের প্রাসাদ গড়েছেন। তাদের সবই আছে—নেই শুধু গান।

নাটকীয়তার দিক থেকে দেখতে গেলে প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে তা হল খণ্ডরূপের সঙ্গে রূপাতীত অরূপের সংঘাত। রূপ ধারণার বস্তু অরূপ ধ্যানের সামগ্রী। রূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য লোকের উপাদান, অরূপ ইন্দ্রিয়াতীত ইন্দ্রলোক, রূপ প্রেক্ষণার অতৃপ্তি, অরূপ প্রৈতির প্রশান্তি। সংঘাত এদের মধ্যে চিরন্তন—কালপ্রসারী। 'রাজা' নাটকটি এই সংঘাতের ভিত্তিতে রচিত। তাই দেখি সংঘাত বেধেছে গানের সঙ্গে অভিমানের, সুরের সাথে অহঙ্কারের, ঝঙ্কারের সাথে হুঙ্কারের। জয় হয়েছে কার? জয়ী হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই গান, সুর, ঝঙ্কার। কারণ প্রতিটি মানুষের চিত্তে আছে বিশ্বচিত্ততার ব্যঞ্জনা, খণ্ড রূপের মধ্যে অরূপের ছোঁয়া, গূঢ় প্রবর্তনা। রূপ ছাড়াতে চইছে তার সীমা। তার এই আকুতি, প্রৈতি জয়যুক্ত হবেই—নইলে থেমে যাবে প্রাণের গতি—জীবনের এষণা। এই প্রতিপাদ্য তত্ত্বের মূল ভাবটুকু ফুটিয়ে তুলেছেন কবি গানের ভিতর দিয়ে—নাটকীয় সংঘাতের পথে। লক্ষ্য করতে হবে, এই নাটকে রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর প্রতিভার, কল্পনার খেয়ার কাজ করেছে তাঁর গীতিময় গদ্য—কবি-ব্যক্তিত্বের স্পর্শপাতে গদ্য কাব্যের স্তরে উন্নীত হয়েছে ; তৎসত্ত্বেও, কবি, রাজার দলে যারা তাদের আরও মুক্ত, আরও লঘুপক্ষ করে দেওয়ার জন্য তাদের কণ্ঠে সঙ্গীত-মূর্ছনা আরোপ না করে পারেন নি—অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় চেতনার সূক্ষ্মভাবের সুরে রূপ পরিগ্রহ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

এই প্রসঙ্গে নাটকের চরিত্র এবং ঘটনা সংঘাতের ভিতরে যে ভাবে কবি উপযুক্ত ভাবরূপকে বিধৃত করেছেন তারও সামান্য আলোচনা করা যেতে পারে। এই আলোচনাতে দেখা যাবে যে সঙ্গীত যোজনা নাটিক তাৎপর্যের দিক থেকে অপরিহার্য।

রাণীর নাম সুদর্শনা, তিনি আপন সৌন্দর্য সম্পর্কে সচেতন তাই রাজার চাক্ষুষ দর্শনপ্রার্থিনী। সখী সুরঙ্গমা। 'রঙ্গ' এক অর্থে বর্ণ আরেক অর্থে লীলা। দুই অর্থেই তিনি সার্থকনামা। ঠাকুর্দাদা রূপাতীতের বার্তাবাহী,—চিরপুরাতন সৃষ্টির উষাকালে আলো-আঁধারের লীলাচাঞ্চল্য তাঁর চিত্তে প্রতিফলিত। আর রাজা শুধু নামটিতেই সকলের চিত্তের অধিপতি, সকলের তীর্থক্ষেত্র,—সার্থকতার ত্রিবেণীসঙ্গম। অন্যদিকে যারা অন্য রাজ্যের লোক অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ পৃথিবীর লোক তাদের কাছে রাজার একটি বিশেষ অত্যাচার, অন্যায় জুলুমের উৎকট সংমিশ্রণে তৈরী ভয়াবহ চেহারাও আছে। যে রাজাকে দেখলে অন্তরাত্মা ভয়ে বাঁশপাতার মতো হি হি করে কেঁপে ওঠে। 'বেটার শির লে আও' না বলা পর্যন্ত তার উপকরণ সমৃদ্ধ অবস্থানকে যেন জানাই যায় না। কবি আধুনিক রাজাদের ( আসল এবং মেকি রূপ ) সম্পর্কে কতবড় সত্যকথা বলেছেন সেইটা সহজেই বোঝা যায়। পক্ষান্তরে সন্দেহ থাকে না কবির মহত্তম উপলব্ধির অলোকসামান্য সার্বজনীন শাশ্বতরূপ সম্পর্কে। এইখানে আছে সুবর্ণ বর্ণাঢ্যতার চোরা কারবারী। আর এমন কাব্যালোকে বিদেশীদের নাম কাঞ্চীরাজ অবন্তীরাজ, কোশলরাজ! পৃথিবীর অধীশ্বর রাজারা এমনই কাঞ্চী, কোশল, অবন্তীর সঙ্গে মিলে পরস্পরের যোগসাজসে লুণ্ঠন করেছে জাগতিক সম্পদ, ঐশ্বর্য বর্ণাঢ্যতার চকমকি গায়ে এঁটে, সত্যরূপের নকল ছাপ গায়ে এটে। সুবর্ণকে সামনে রেখে দর্শনেন্দ্রিয় সুদর্শনাকে জয় করতে চেয়েছে সুকৌশলে। কিন্তু যখনই দর্শনপিপাসা রূপকে ছাড়িয়ে অরূপের গভীর আস্বাদ পেয়েছে তখনই ঝড় এসেছে। এদের কথা রূপকথা, কথার গায়ে রূপসজ্জা জুড়ে ক্ষণিক আনন্দের, জয়ের তাসের ঘর বানিয়ে যখন সত্যকে হনন করতে উদ্যত হয়েছে তখনই হারিয়ে গিয়েছে হাজারলোকের মিছিলে।

এইদিক থেকেও গানগুলোর তাৎপর্য অসাধারণ। কারণ একই সঙ্গীতহীন বাস্তব যখন গীতিময় অসামান্য অরূপকে আহ্বান করে শক্তি পরীক্ষায়—বারেবারেই তা করেছে, তখনই দেখা গেছে সুরের ঢেউ এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে স্বরহীনতার অন্ধকার গহ্বরময় খুপরীগুলোকে। চরম দুঃখের মূল্যে মানুষ হয়েছে দুঃখাতীত ; খুঁজে পেয়েছে আপন সত্তার সত্য স্বরূপকে, সৌন্দর্য, আনন্দকে। এই মূলভাবের অনুসারিতায় 'রাজা' নাটকের গানগুলো পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত হয়ে নাটকীয়তাকে অভিব্যক্ত করেছে। নাটকীয় সংঘাতের মূল উপজীব্যতাকে অটুট রেখেও স্থূলতাকে পরিহার করবার অবকাশ রচিত হয়েছে সঙ্গীতে। ফলে সঙ্গীত নাট্যছন্দের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে সংযুক্ত হয়ে কাব্যিক ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করেছে।

'তপতী' নাটকটির গানগুলোও বিচার করলে দেখা যাবে নাটকের মূলতত্ত্ব সঙ্গীতের তাল, লয়, ছন্দ ও সুর ব্যঞ্জনার পথবাহী হয়ে সমগ্র নাটকের নাটকীয়তাকে অভিব্যক্ত করেছে। দেব আবাহনের মন্ত্রোচ্চারণের মতো নাটকের সমগ্রতাকে আহ্বান জানানো হয়েছে নাটকের প্রারম্ভ সঙ্গীতে। প্রেমের যে মহান সার্থকতা ত্যাগে রুদ্রভৈরবকে তার মূর্ত প্রতীকরূপে নাটকের প্রারম্ভিকতায় সঙ্গীত নৈবেদ্য অর্চনা করা হয়েছে। যে মহান প্রেমের স্পর্শমাত্রে মৃত্যুকে অতিক্রম করবার অবিচলতা



আসে, শক্তির প্রচণ্ডতাকে যিনি, 'নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখেব রাজো' স্বরূপ আত্মস্থ করেছেন আপন সত্তায় তাঁর উদ্বোধনী মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে প্রথম সঙ্গীতে। সঙ্গীত ছাড়া শুধু কথার সাধ্য ছিল না এই আবেগঘন মানসিকতাকে উন্মোচন করবার। শক্তি ও বীর্যবত্তার ঐ সমাধিস্থতাকে নিঃসীম স্পর্দ্ধায় যে আলোড়িত করতে গিয়েছিল, শক্তি ও ভোগের পথে তাঁকে আহবান জানিয়েছেন রাজা বিক্রম মৌনকেতুর স্তব সঙ্গীতে। জীবনে ভোগের উজ্জ্বলতা ছাড়া ত্যাগের স্থৈর্য আশা-সম্ভব নয়। ভৈরব যদি মৌনকেতুকে ভস্ম করে থাকেন, তবে ভস্ম করবার প্রয়োজনীয় মুহূর্ত সৃষ্টির অমোঘ ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দিয়েই তা করেছেন। মৌনকেতু ভস্মীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রচনা করেছে ভৈরবের ত্যাগমহান চিত্র। কাজেই মদন ভস্ম এবং ভৈরবের নিরাসক্তরূপ পারস্পরিক নির্ভরশীল। তাই জীবনে তার উদ্বোধনও পরম সত্য।

'তপতী' নাটকের এই মূলতত্ত্বটি গানের ভিতর দিয়ে ঘটনা সংঘাতের সূত্র ধরে অভিব্যক্ত হয়েছে—নাটকীয়তাকে মেলে ধরেছে। প্রথম দৃশ্যের বিক্রমের গানের আরোহণ অবরোহণকে কেন্দ্র করে উচ্ছ্বসিত হয়েছে বিপাশার গান। প্রাণোজ্জ্বলতার যে ব্যঞ্জনা এবং দোতনা জীবনে পরিপূর্ণতা আনে, বাস্তবতার মধ্যে থেকেও খণ্ড বিচ্ছিন্নতাকে মিলিয়ে জীবনের পরিপূর্ণ পরম প্রকাশকে অখণ্ডতার পথবাহী করে তোলে, বিপাশার সঙ্গীতাংশে সুমিত্রা-বিক্রমের সঙ্গীতের পরিপূরক হিসেবে জীবননাট্যের সেই অংশকে মেলে ধরেছে। একক হিসেবে জীবনের বাস্তবানুভূতিতে সমুজ্জ্বল নরেশ-বিপাশার জীবনের স্নিগ্ধতা যেমন নাটকের নাটকীয়তাকে কেন্দ্রায়িত করেছে তেমনই বিপাশার গান এই গতির অনুসৃতিতে লোক-জীবনের প্রাণস্বাকে আবেগোজ্জ্বল মুহূর্তে কখনও প্রেমানুভূতির তীব্রতায় কখনও বীরপূজার আহ্বান মন্ত্রে, কখনও সুপ্ত আত্মশক্তির উদ্বোধনে সুরে, ছন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

মোটামুটিভাবে এই নাটকটির মূলমন্ত্রটি সঙ্গীত বিধৃত বললে অত্যুক্তি করা হবে না। ভাবঘন তীব্রতার মুহূর্তে যেমন সঙ্গীত উৎসারিত হয়, তেমনই জীবনবোধের ভাবঘন নিবিড়তার সূক্ষ্ম অথচ তীব্র আবেগ থেকে উৎসারিত হয়েছে নাটকের সমগ্রতা এবং নাটকীয়তা। 'তপতী'র গানগুলো ঐ সমগ্রতাকে ধরে রেখেছে।

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকের দুইটি দিক আছে, একটি তত্ত্বঘটিত অপরটি নাটকীয় বাস্তবতার দিক। কবি পরস্পরবিরোধী দুইটি ভাবকে হরগৌরীর মতো যুগনদ্ধ করে প্রকাশ করেছেন এবং এর আলম্বন হ'ল সঙ্গীত। এইখানে রবীন্দ্রনাটকে সঙ্গীত যোজনার সার্থকতা। যদি দুঃসাহস না হয় তবে বলব রবীন্দ্রনাথের নাটকের গানগুলোকে পরপর সাজিয়ে সামনে ধরলেই নাটকের সংঘাত এবং উত্তরণ অনুভব করা যায়—মূল বক্তব্য সহজেই অনুধাবন করা যায়।

# বঙ্কিম সাহিত্যের বর্ণানুক্রমিক আলোচনা

অশোক কুণ্ডু

**হস্তিনায় প্রথম দিবস** ( কৃঃ চঃ ৫/৬ ) ॥
কৃষ্ণের আগমন সংবাদ পেয়ে ধৃতরাষ্ট্র রাজসভায় আড়ম্বর করার জন্যে ব্যস্ত হলেন। বিদুর বললেন যে তার তেমন প্রয়োজন নাই, বরং কৃষ্ণের উদ্দেশ্য যাতে সফল হয় সেই চেষ্টা করুন। দুর্যোধন কিন্তু কৃষ্ণকে বন্ধনের পরিকল্পনা করলেন। যাইহোক কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভায় দর্শন দিয়েই তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা দরিদ্র বিদুরের গৃহে আশ্রয় নিলেন। সেখানে কুন্তী ছিলেন। কুন্তীকে বিদুরের গৃহে রেখে পঞ্চপাণ্ডব বনগমন করেছিলেন। কৃষ্ণ কুন্তীকে পঞ্চপাণ্ডব সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। তারপর পুনরায় তিনি এলেন ধৃতরাষ্ট্রর রাজসভায়। দুর্যোধন তাঁকে অন্নগ্রহণ করতে বললে তিনি অস্বীকার করলেন। বিদুরের গৃহে সামান্য আহার্য দ্বারাই তিনি আতিথ্য স্বীকার করলেন। সেই সময় তিনি যে সমস্ত রাজনীতির কথা বলেন তা যথার্থ রাজনীতিবিদদের গ্রহণযোগ্য।

**হিন্দু কি জড়োপাসক?** ( দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম ) ॥ প্রঃ প্রকাশ—প্রচার, ১ম বর্ষ, পৃ. ৪২৭-৩০।
হিন্দুরা মূর্তিপূজা করে বলে অনেকে হিন্দুদের জড়োপাসক বলে থাকে। কিন্তু হিন্দুরা যে সমস্ত শক্তির উপাসনা করে থাকে, তাকে সে চেতনপদার্থ বলেই জানে। জড় বস্তু হিন্দুদের কাছে মৃতের ন্যায় অস্পৃশ্য।

**হিন্দুধর্ম** ( দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম ) ॥ প্রঃ প্রকাশ—প্রচার, ১ম বর্ষ, পৃ. ১৫-২৩।
বঙ্কিমের সমকালে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রচেষ্টা চলে। তখন কেউ কেউ হিন্দুধর্মের আচার-আচরণগুলির উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয় করার প্রয়াসী হয়েছেন। অবশ্য সেকাজ যে খুব সহজসাধ্য নয়, তাও তিনি স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হননি।

**হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে একটি স্থূল কথা** (দেবঃ ও হিন্দুঃ) ॥
প্রঃ প্রকাশ—প্রচার, ২য় বর্ষ, পৃ. ৭৪-৮০।

এখানে ঈশ্বরতত্ত্বের আলোচনা করা হয়েছে। বেদে বিভিন্ন দেবতার কথা আছে। পরবর্তীকালে দেবতাদের সঙ্গে শক্তিমান ঈশ্বরকে একীভূত করা হয়। উপনিষদে সমস্ত দেবতাকে ঈশ্বরের মধ্যে বিলীন করে দেওয়া হয়েছে। আনন্দময় ব্রহ্মই সেখানে উপাস্য দেবতারূপে বিরাজমান। কিন্তু বঙ্কিমের মতে এখানেই হিন্দুধর্মের চরম উৎকর্ষ ঘটেনি। গীতার উক্তির মধ্যেই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হয়েছে।

**হিন্দুধর্মে ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই** ( দেবঃ ও হিন্দুঃ ) ॥
প্রঃ প্রকাশ—প্রচার, ২য় বর্ষ, পৃ. ২৭৪-২৭৮।

বঙ্কিমচন্দ্রের এখানে সিদ্ধান্ত এই যে—'ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতা নাই। যে অন্য দেবতাকে ভজনা করে সে অবিধিপূর্বক ঈশ্বরকেই ভজনা করে।'



**হেমন্ত বর্ণনাচ্ছলে স্ত্রীর সহিত পতির কথোপকথন** ( বাল্যরচনা—পুঃ অপ্রঃ ) ॥
প্রঃ ছত্র—'রাখ রাখ প্রিয়ে, | বসনে ঢাকিয়ে, | জলদ চাঁচর চয়।' প্রঃ প্রকাশ—সংবাদ প্রভাকর, ১০ জানুয়ারী, ১৮৫৩।

লঘু ত্রিপদী ছন্দে রচিত কবিতাটিতে, পতি স্ত্রীর প্রশংসা করে হেমন্তের প্রকৃতির পরিবর্তনের এক একটি কারণ জিজ্ঞাসা করছে এবং স্বামী স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রীর রূপ ও গুণের প্রশংসায় মত্ত। বর্ণনায় ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব যেমন আছে, তেমনি কোথাও কোথাও অশ্লীলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। এটি হুগলি কলেজের ছাত্রাবস্থার রচনা।

## আ লো চ না

### রুচিবিকার—উৎসবে

একটি জাতির পরিচয় তার উৎসবের মধ্য দিয়ে যেমন ধরা পড়ে এমন আর কিছুতে নয়। কিন্তু আমাদের অর্থাৎ বাঙালীদের উৎসবের যে চিত্র আজ প্রকাশ পাচ্ছে তার মধ্যে রুচির প্রকাশ কতটা দেখা যায়?

আগের দিনে উৎসব সজ্জার সূচনা থেকেই একটা স্নিগ্ধ পরিশীলিত পরিমণ্ডল গড়ে উঠতো, যা থেকে সুরুচির পরিচয় পাওয়া যেত। বাড়িতে ঢোকার মুখেই নহবত। ধনী-গৃহে পাকা নহবতখানা থাকা রেওয়াজ ছিল, সাধারণ ঘরে সাময়িক বাঁধা মঞ্চের ব্যবস্থা করা হতো, স্থানাভাবে প্রবেশপথের ধারে—যেখান থেকে উৎসবোপযোগী সুরলহরী প্রকাশিত। দরজায় সুন্দর আলপনা ফুলের তোড়া বা রিং বা মালায় সাজানো, বসার ঘরে সুদৃশ্য ফরাস, তার ওপর তাকিয়া, ক্ষেত্রবিশেষে পারস্য গালিচার ওপর কিংখাবের তাকিয়া, গড়গড়া আলবোলা সুগন্ধী অম্বরী তামাক, স্বাগতম লেখা না থাকলেও আমন্ত্রিত ব্যক্তি স্বাগত অনুভব করতো। আর এখন ডেকরেটারের কেঠো চেয়ার, যা যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। নহবতের জায়গায় কর্কশধ্বনিসৃষ্টিকারী মাইক, যার থেকে নির্গলিত সুর ঝঙ্কার হৃদরোগ সৃষ্টি না করলেই বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

একদা কবি অতুলপ্রসাদ বলেছিলেন—

কি যাদু বাংলা গানে
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
গেয়ে গান নাচে বাউল
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।

তিনি কিন্তু ভদ্র বাঙালীর গানের কথা বলেন নি। তা না বলুন, তাঁর যুগের ভদ্র বাঙালীরা যে গান গাইতেন তার একটা দাম ছিল যার উল্লেখ করেই কবি বলেছিলেন,

বাজিয়ে রবি তোমার বীণে
আনলো মালা জগৎ জিনে
তোমার চরণতীর্থে মাগো
জগৎ করে যাওয়া আসা।

আবার অন্যত্র আছে—

জগৎ কবি সভায় মোরা তোমার করি গর্ব
বাঙালী আজ গানের রাজা বাঙালী নয় খর্ব।

কিন্তু হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল! তাই আজ বাঙলাদেশের বাঙলা গানের জায়গা



নেই। (বাঙালীর কিইবা আছে? অবশ্য অধুনা বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রীয় সত্বাকে বোধ হয় এ থেকে বাদ দেওয়াই সমীচীন কারণ তার বাঙালীয়ানার গর্ব যথেষ্টই আছে।) আজকের চাষা হালের গায়ে ট্র্যানজিস্টার ঝুলিয়ে বিবিধ ভারতী বা রেডিও শিল (ওটা সিলোনের অপভ্রংশ মাত্র) শোনে।

এহেন অবস্থায় আমাদের উৎসবে যে 'ববিতা মাই ডার্লিং' 'কি হরে রাম হরে কৃষ্ণ' বাজবে এতে আর বিস্ময়ের কি আছে? যদি কারো বাঙলার ওপর একটু সুনজর থাকে তো রবীন্দ্রনাথের দু' একখানা গান শোনা যেতেও পারে (তবে বিয়ে বাড়িতে যদি, 'আমি জেনেশুনে বিষ করেছি পান' শোনেন অবাক হবেন না, গানবাজনার সময় আমাদের যত্ব-ণত্ব লোপ পায়। বিশ্বাস করুন আমি এক বিয়ে বাড়িতে 'হরি দিন যে গেল সন্ধ্যা হল পার কর আমারে' শুনেছি!) আর নয়তো 'যাব কি যাব না' জাতের হিন্দী গানের বঙ্গানুসরণ শোনা যাবে।

যে গৃহে অনুষ্ঠান সেখানকার গৃহকর্তা থেকে আমন্ত্রিত সরাই প্রায় সার্ট-প্যাণ্ট পরে থাকেন, কারণ তাতে নাকি অনেক সুবিধা। আমাদের এই গরম দেশে ও পোষাকে সুবিধা হয় এমন কথা আমি মানতে রাজী নই। কাজের সময় ও পোষাকে কিছুটা সুবিধা হয়, বিশেষ করে যেখানে যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে হয় কিন্তু সামাজিক অনুষ্ঠানে কেন তার জের টানবো? তাছাড়া যাদের অনুকরণে আমরা অফিস থেকে বিয়ে বাড়ি, শ্রাদ্ধ বাড়ি সর্বত্র একই পোষাক পরি তারা কিন্তু সামাজিক অনুষ্ঠানে ভিন্ন পোষাক পরে। ড্রেস স্যুট নিদেন পক্ষে লাউঞ্জস্যুট, বো-টাই, মানানসই জুতো ছাড়া ইউরোপীয়দের কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে দেখা যায় না। এশিয়ায় যারা সবচেয়ে কেজো লোক সেই জাপানীরা আমাদের মতই ইউরোপীয় পোষাককে কাজের পোষাক করেছে, ঘরের পোষাক করেনি। সদ্যস্বাধীন আফ্রিকার দেশগুলির কিছু ছাত্রকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল, দেখতাম এমনিতে তাদের পোষাক পুরোপরি ইউরোপীয় প্যাটার্ণের কিন্তু কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে এলেই নিজেদের ঝোব্বাঝাব্বা লাগিয়ে আসতো। অর্থাৎ নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতো। একমাত্র আমাদের মেয়েদের মধ্যেই পোষাককে জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি আনুগত্য দেখা যেত চিরাচরিত শাড়ী-ব্যবহারে কিন্তু ইদানীং লুঙ্গী, ম্যাক্সি প্রভৃতির দৌরাত্ম্যে সে আনুগত্যেও চিড় খেতে আরম্ভ করেছে।

আনুষ্ঠানিক আহারাদির ক্ষেত্রে এখনো পুরোপুরি রুচিবিকার দেখা যায় নি, কিন্তু রুচিবিকারের সূচনা দেখা যাচ্ছে। তবে এঁদের পক্ষে বলার কথা কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে কাকের মাংস আর মদ খাওয়াওতো এদেশীয় রুচির মধ্যে পড়ে, তা ততদূর পৌঁছে তাকে অতিক্রম করলে তবেতো রুচিবিকারের প্রশ্ন উঠবে?

একথার জবাব যখন দেওয়ার রাস্তা নেই তখন পাঠক সাধারণের ওপর বিচারের ভার ছেড়ে দিচ্ছি।

রবি মিত্র

**স্বদেশীয় ভারত-বিদ্যাপথিক**। গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত। রূপা এ্যাণ্ড কোম্পানী ১৫ বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট। কলিকাতা-১২। মূল্য ছয় টাকা।

শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত অসিচালনায় সপটু কিনা জানি না কিন্তু পাঁচজন মধ্যবিত্ত ভদ্র বাঙালী সুসন্তানদের মত কর্মজীবনে ছিলেন সরকারী কর্মচারী। তিনি জীবিকার জন্য সরকারী কাজের পাওনা বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু জীবন নিয়ে দীনগত পাপক্ষয় করেন নি। প্রাচীন ভারত তাঁকে হাতছানি দিয়েছিল এবং সে ডাক তিনি প্রাণ দিয়ে শুনেছিলেন। তাঁর মন চলে গিয়েছিল অদূর ও সুদূর অতীতে। তাঁর মানসিক প্রস্তুতিতে, প্রয়াসে, মনে হয়েছিল কোথায় সেই ভারতপথ-পথিকরা কোথায় সেই বিদেশী ও স্বদেশী ভারত-বিদ্যা রথী মহারথীরা যারা পাথুরে প্রমাণ খুঁজে, বিলুপ্ত ভাষার পাঠোদ্ধার করে শিলা-লেখ, অনুশাসন পড়ে পুরাতনী স্মৃতিকে নবীন করে তুলেছেন, প্রাচীনের পদ্মোদ্ধার করেছেন। তাঁদের কথাই গৌরাঙ্গবাবুর মনে লেগেছে এঁরাও জ্ঞানতপস্বী—সৃষ্টিশীল মনস্বীর দল এও এক ধরণের বিদগ্ধ মননের বিলাস। এরই ফলশ্রুতিস্বরূপ আমরা পেয়েছি পর পর তিনখানি বই। আলোচ্য পুস্তকটি তারই অন্তর্গত। 'ভারতীয় প্রজ্ঞার নবাবিষ্কার' এই নামকরণ করেছেন একজন সুরসিক সাহিত্যযোদ্ধা পণ্ডিত। এই অভিধা সার্থক।

ইতিহাস বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি ঘটনার পর ঘটনার লম্বা এক ফিরিস্তি ( record of events ) বা কোন রাজামহারাজা সম্রাটের জয়-পরাজয়ের বিবরণ, না হয় বংশলেখমালা, না হয় বুরঞ্জী বা ওয়াকিয়া-নবীশের বা সভাকবির অত্যুক্তিভরা দোষগুণকীর্তনাবলী নির্ভর দুরূহ শিলালেখ, প্রশস্তি, মুদ্রা, মূর্তি অর্থাৎ স্থাপত্য, ভাস্কর্য ইত্যাদি নিদর্শন নিয়ে পণ্ডিতী আলোচনা বা সেই যুগের সাহিত্যের শিল্পের পরিচয় বা পরিব্রাজকের ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে মালমশলা যতটুকু পাওয়া যায় তার সংগ্রহ। ইতিহাস কিন্তু শুধু ঐ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ নয়, তার চেয়েও বেশী। মৃত্তিকার তথ্য থেকে তত্ত্বে পৌঁছতে আমরা ভালবাসি কিন্তু ঘটনাপঞ্জীর শাসনকে না মেনে অর্থাৎ discipline of facts-কে সম্পূর্ণ মর্যাদা না দিয়ে, অনুমান বা কিম্বদন্তী নির্ভর হয়ে। ইতিহাস শুধু রেকর্ড নয়, তার চেয়েও বেশী—একটি জাতির বা দেশের বা গোষ্ঠীর মনমন্ত্রিত আগ্রহ-সংগ্রহের পরিচয়। শুধু অশোকের কটা ছিল নাতি বা আওরঙ্গজেবের কটা ছিল হাতি, এই সব ঘটনার ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করাই ইতিহাসের শেষ কথা নয়, কারণ ইতিহাসে রাজা-মহারাজা—সামন্ত-সেনাপতি, শাস্ত্রকার-লিপিকাররা প্রধানদের ভূমিকা গ্রহণ করলেও সত্যিকার ইতিহাসের এগুলি বহিরঙ্গের কাহিনী। জানি কট্টর বিশ্লেষণধর্মী ঐতিহাসিকেরা হয়তো মুচকে হাসবেন, বলবেন ইতিহাস রম্যরচনা বা দর্শন নয়, কিন্তু টয়েনবীর মত চিন্তাশীল ঐতিহাসিকরা তবু খুঁজবেন—সৃষ্টিশীল স্থায়ী সত্তাটিকে মানব-প্রকৃতির মাঝখানে। সতিকার ইতিহাস গড়ে ওঠে এই বিশ্লেষণ



ও সংশ্লেষণের মাঝখানে—যাকে বলা হয়েছে Historiography বা ইতিহাস চিন্তা। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্প্রতি Heras Institute of Indian History and Culture Bombay-এর আমন্ত্রণে ইতিহাস পঠনপাঠনের এই বিশেষ দিকটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যা ইউরোপে দুইজন ঐতিহাসিক দিকপাল নীবুর ( Neibur ) এবং লিওপোল্ড ভন্ র‍্যাঙ্কে ( Leopold Von Ranke ) করেছিলেন। নীবুর বলেছিলেন, চূড়ান্তভাবে অনুসন্ধান করে লিখতে হবে তবেই 'objective treatment of history' সম্ভব। কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণীর লেখক কলহন্‌ও দ্বাদশ শতাব্দীতে কাশ্মীরের ইতিহাস সম্পর্কিত অন্ততঃ এগারোটি গ্রন্থ পরীক্ষা করে ও যোগিত আইনের অনুলিপি ও খোদিত লিপির সাহায্যে তার ইতিহাস তৈয়ারী করেন। সেইজন্য আকরতথ্য ও বস্তুর সংগ্রহ, তার বিচার ও বিশ্লেষণ, ও আলোচনার প্রয়োজন।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ ভাণ্ডারকর, মহামহোপাধ্যায় বাপুদেব শাস্ত্রী, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর, ভগবানলাল ইন্দ্রজী, সত্যব্রত সামশ্রমী, রমেশচন্দ্র দত্ত, শরচ্চন্দ্র দাশ, কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ, আনন্দরাম বরুয়া, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী এই পনেরোজন মনীষির সারস্বত প্রচেষ্টা ও জীবনী আলোচনা লেখক করেছেন, যদিও আরো অনেকের কথা ( স্বদেশী ও বিদেশী ) তিনি অন্যত্র বলেছেন এবং তাঁর ঝুলিতে আরো কয়েকজন সম্পর্কে আলোচনা আছে। ভারী ভালো লাগলো যে উনবিংশ শতাব্দীর বেশ কয়েকজন বিদগ্ধ মনীষিকে তিনি লোকমানসে পুনরুজ্জীবিত করেছেন, যাঁদের কথা বিস্মরণ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাঁদের প্রতিভাদীপ্ত কর্ম ও জ্ঞানজীবনের কিছুটা ছবি লেখক এমনভাবে তুলে ধরেছেন যে তাঁদের ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রগুলিও পরিস্ফুট হয়েছে। ফলে আমাদের লাভ হয়েছে দুদিক থেকে, শুধু মনীষি স্মরণ নয়, পিতৃরিকথের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন নয়, সেই সেই আলোচ্যবস্তুর ঐতিহাসিক মূল্যায়ণ সম্বন্ধেও কিছু জান। শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং বা শ্রদ্ধৎস্ব সোম্য এই কথা বলি বটে কিন্তু এই সব সারস্বত পিতৃ-পুরুষদের কথা জানি না, বুঝি না যে এই সাধনায় মধুমানও হওয়া যায়। বইটিতে মুদ্রাকর প্রমাদ কিছু আছে—সবকিছু মালমশলার সম্যক আলোচনাও হয়তো নেই—স্বল্প পরিসরে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি সম্ভব নয়। যেমন কোন সমালোচক বলেছেন যে 'ভাণ্ডারকর পদ্ধতি'র আলোচনা থাকলে আরো উপকৃত হতে পারতো পাঠকপাঠিকারা। তবু আমরা অনেক কথা জেনেছি, শিখেছি, আমাদের চিন্তার বেগকে তিনি দ্রুত করেছেন, নির্দেশ দিয়েছেন, সেইজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। কতকগুলি বিস্ময়কর সংবাদও তিনি সংগ্রহ করেছেন। তজ্জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই।

বহুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ একদিন বলেছিলেন যে ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করে পরীক্ষা দিই তা ভারতবর্ষের নিশীকালের একটা দুঃস্বপ্ন কাহিনী মাত্র। একথা আজকের পরিপ্রেক্ষিতে খানিকটা কবিজনোচিত অত্যুক্তি হলেও কোথা হতে কারা এলো, কাটাকাটি মারামারি পড়ে গেলো, বাপেতে ছেলেতে, ভায়েতে ভায়েতে সিংহাসন নিয়ে টানাটানি চলতে লাগলো, একদল যদি বা যায়, কোথা থেকে আর একদল উঠে পড়ে—পাঠান, মুঘল, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ইংরেজও রক্তবর্ণরঞ্জিত এই পরিবর্তমান দৃশ্যপট। এর পিছনে খণ্ড ইতিহাসের উপাদান পাওয়া

গেলেও অথণ্ড সূত্রটিকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ইতিহাস পড়তে ও পড়াতে বসে আমরা মাঝে মাঝে এই মৌলিক ভুলটিই করে বসি যে কোনো দেশের, কোনো জাতির, কোনো সময়ের একটা গোটা ইতিহাস পেতে গেলে কি কি উপাদান দরকার—শুধু তাম্রশাসন, মুদ্রা, শিলালিপি, শাসক সম্প্রদায়ের অতিরঞ্জিত প্রশস্তি বা বিদ্বেষপ্রসূত বিবরণী, জয়স্কন্দাবারের কাহিনী, রাজমালাই কি যথেষ্ট না এই সব 'এহবাহ্য' কঙ্কালস্তূপ পেরিয়ে আমরা খুঁজবো তারা কেমন ছিল, তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা কামকামনা লাভ লোভ ক্ষুধা কেমন ভাবে ফুটে উঠতো, তাদের ধর্মবিশ্বাসের বিবর্তনের খবর, তাদের রাষ্ট্রবোধের চেতনার অঙ্কুর, কোন মাৎস্যন্যায়ে তাদের কোনদিকে গতি, তাদের সমাজসংগঠন ও বিন্যাসের ধারা, তাদের শিল্পসাহিত্যের পরিচয় কোন ভূর্জপত্রে লিপিবদ্ধ কোন প্রস্তরখণ্ডে উৎকীর্ণ। পুরাতনকে মূল্য দিতে হবে শুধু পুরাকীর্তি চর্চার জন্য নয় ভবিষ্যতের অমোঘ ইঙ্গিত ও যে সেখানে। ইতিহাসের ধারাবাহিকতা গতিময় তার রথচক্র থামে না, তার পরিণতি রূপ থেকে রূপান্তরে।

তাই গৌরাঙ্গবাবুর বইটি পড়ে সেই জ্ঞানমার্গী ইতিহাস পথিকদের স্মরণ করতে চেয়েছি। যেমন চন্দ্রকান্তের বৈযেশিক দর্শনের বিশেষ টীকায়, বা বৈদিক ব্যাকরণের কাতন্ত্রচ্ছন্দ প্রক্রিয়া আলোচনায় বা ভাণ্ডাজীর কালিদাস সম্বন্ধে বিতর্কে বিচারে বা রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকরের শুধু শৈবপ্রকরণের বিবরণীতে নয়, দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্র ভৃত্য রাজারা কারা এর চিন্তায়, ত্রৈকূটক রাজা কে ছিল, সত্যব্রত সামশ্রমীর বিবাহ কাহিনীতে নয়, 'প্রত্নকর্মনন্দিনী' পত্রিকার খবরেও রমেশচন্দ্র দত্তের ভারতীয় সভ্যতার মনোজ্ঞ ইতিহাসে, শরচ্চন্দ্র দাশের 'Indian Pandits in the land of Snow' পুস্তকে বা তিব্বতীয় ভাষার ব্যাকরণের বা আনন্দরাম বরুয়ার নামলিঙ্গানুশাসন ও ধাতুবৃত্তিসার নামক গ্রন্থসংকলনে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে দেখেছি, কাছে গেছি, বক্তৃতা শুনেছি, কিন্তু লোকায়ত দর্শন সম্বন্ধে যে তিনি লিখেছেন একথা জানা ছিল না। যেমন ছিল না গণপতি শাস্ত্রী মশাই প্রথমে ত্রিবন্দ্রম সংস্কৃত গ্রন্থমালায় ভাসের নাটকের আবিষ্কর্তা যা সেকালে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল সুধীমহলে, বিশেষ করে এই কারণে যে ভাস, কালিদাস-পূর্বসূরী। ইতিহাসকে যারা The ricepot and the rupee policy, Fire and steel, the Dungeon and the Rack বা হিদেনদের অমৃতালোকে নিয়ে আসবার প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত করে দেখেন, গৌরাঙ্গবাবু সেদলের নন্ তিনি যাঁদের কথা বলেছেন, তাঁরা ইতিহাস ও সংস্কৃতির ন্যাস-রক্ষক হিসাবে কাজ করেছেন। সেই হিসাবে তাঁরা আমাদের নমস্য এবং গৌরাঙ্গবাবুও তাঁদের জীবিকা ও জীবনের সঙ্গে আমাদের যে মূল্যবান পরিচয় করিয়ে দিলেন তার জন্য শ্রদ্ধার পাত্র। জানি সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক টয়েনবী কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির এক সভায় বলেছিলেন যে, 'Our psyche cannot be recorded in its entirety. Our actions are also controlled. So true history in never written. But within these limitations we have to move. আবার একথাও জানি (স্যার যদুনাথের কথা)……Indian historical studies are at present at a much more primitive stage than Roman history was when Gibbon began to write. We have yet to collect and edit our materials, and to construct the necessory foundation—the bedrock of ascertained



and unassailable facts on which alone the superstructure of a philosophy of history can be raised by our happier successors.'

বইটির প্রকাশক 'রূপা' কোম্পানী সুধী মহলে বিশেষ পরিচিত, তাঁদের প্রকাশিত পুস্তকগুলির একটু বৈশিষ্ট্য সব সময়েই পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য পুস্তকটির প্রকাশের ভার গ্রহণ করায় তাঁরা সেই সুনাম রক্ষা করেছেন। নতুন ধরণের নূতন স্বাদের বই এটি। নির্ঘণ্ট ও গ্রন্থপঞ্জিগুলি বিশেষ মূল্যবান।

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

**Message of India :** Ranajitkumar Sen : Published by P. P. Sen from Sen's Book Corner, 24 N Garcha First Lane, Calcutta-19 : Price Re. 1·00

রণজিৎকুমার সেন শুধু কবি, উপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার হিসাবে সুপরিচিত নন, মননশীল প্রাবন্ধিক হিসাবেও তিনি সুধীসমাজের গভীর দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। তাঁর প্রবন্ধ রচনার অন্যতম বিষয় বাংলা তথা ভারতের সংস্কৃতি। তিনি মনে করেছেন বর্তমান যুগে বিভিন্ন দেশের মানুষেরা নানা মতবাদের বিষয়ে বিভক্ত হলেও তারা ভারতীয় সংস্কৃতির ধারার আশ্রয়ে প্রকৃত ঐক্যবদ্ধ জীবনে উত্তীর্ণ হতে পারে। এর কারণ ভারতীয় সংস্কৃতি মানুষের অন্তরসত্তা থেকে উৎসারিত। আলোচ্য ছোট পুস্তিকাটির মধ্যে লেখক ভারত আত্মার বাণীকে অন্তরঙ্গ ও প্রাঞ্জলভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

লেখকের মতে নূতন ভারতবর্ষের বাণী চিরন্তন ভারতবর্ষের বাণী থেকেই জন্ম নিয়েছে এবং যুদ্ধ-পীড়িত পৃথিবীতে সেই বাণী সর্বজয়ী সত্যপ্রতিষ্ঠায় সার্থকভাবে ক্রিয়াশীল। 'সত্যমেব জয়তে' এই হচ্ছে নূতন ভারতের বাণী এবং দ্বন্দ্বময় পৃথিবীতে এই বাণী প্রতিষ্ঠার জন্যে ভারতের মহাপুরুষগণের জীবনী ও বাণীর অনুধাবন করা অত্যাবশ্যক। এই বাণীই ভারত দেশদেশান্তরে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সত্যই জ্ঞান এবং সত্য সর্বজয়ী। লেখকের ভাষায়, 'The message of new India is that of truth, 'Satyameva jayate.' It is necessary to study the lives and messages of great Indians in our every day lives to establish that truth in this war-tormented world. New India is carrying the same message from one country to other : 'Satyam, janaman, anantam : Satyameva jayate.' Truth is knowledge, truth triumphs everywhere.'

আজকের হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে বুদ্ধ, নানক, কবীর, শ্রীচৈতন্য, তুলসীদাস, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী প্রমুখ মহাপুরুষদের আবির্ভাবে পূত ভারতবর্ষই শান্তি সংহতি ও মৈত্রীর বাণী শোনাতে পারে। লেখক শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, কবীর, নানক,

শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ মনীষীদের বিভিন্ন উক্তি উদ্ধৃত করে ভারতের চিরন্তন বাণীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। বিবিধ উক্তির পুষ্পগুলিকে একসূত্রে গ্রথিত করে নিপুণ মালাকরের মতো লেখক যে মাল্য রচনা করেছেন তার সৌন্দর্য ও সৌরভে সহৃদয় পাঠকের চিত্ত স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্ট হবে। বর্তমান নৈরাশ্য, অস্থিরতা ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের যুগে এই ধরণের প্রবন্ধ যত রচিত হয় ততই ভালো। লেখক স্বল্প পরিসরে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে যে ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাতে তিনি নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। সময়োপযোগী এই প্রবন্ধ রচনার জন্য লেখক ধন্যবাদার্হ।

সুশীলকুমার গুপ্ত